মরু-মৃগয়া

চিত্তরঞ্জন মাইতি

সাহিত্য প্রকাশ
৫-১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা - ৯

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৭১

প্রকাশক : প্রবীর মিত্র, ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : রবীন দত্ত

মুদ্রাকর : জগৎরঞ্জন মজুমদার, আকরিকা

৭, বিশ্বনাথ মতিলাল লেন, কলিকাতা-১২

রবীন্দ্রসংগীতের মূর্ত-প্রতিমা
দেশ দেশ বন্দিত শিল্পী
শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে
পরম শ্রদ্ধায়—

তিয়েনশান পর্বতমালার আড়ালে সূর্যাস্ত হয়ে গেছে। শেষ রক্তিম আভাটুকু আকণ্ঠ শুষে নিয়েছে পশ্চিম দিগন্ত। পাশাপাশি তিনখানা পটাবাসে (তাঁবু) রন্ধনের আয়োজন চলছে। যারা পটাবাস তৈরির ভার নিয়েছিল তারা তাদের কাজ শেষ করে এখন পাশে পড়ে থাকা পেটিকায় হেলান দিয়ে গল্পে মেতেছে। অন্য দলটি দ্রুত রন্ধন শেষ করার কাজে ব্যস্ত।

অতি প্রত্যুষে বেরিয়ে বণিকের দলটি বহু দুর্গম পথ অতিক্রম করে এখানে এসে পোঁচেছে। এখন শৈলশিরার পাদমূলে চলেছে তাদের বিশ্রামের আয়োজন।

ভারতীয় এই দলটির সহযাত্রী হয়ে এসেছে এক তরুণ যুবা পুরুষ। সুদর্শন সম্ভ্রান্ত-আকৃতি। কেবল দেশ-দর্শনের ইচ্ছাই তাকে টেনে এনেছে এত দূরের পথে। যুবক কুমারায়ণ অদূরে একটি স্রোতস্বতী থেকে জল সংগ্রহের কাজে এসেছিল। সে বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করে দেখছিল চতুর্দিক। উত্তর-পশ্চিমের গিরিমালা অসংখ্য উচ্চাবচ শৈলশিরায় বিভক্ত হয়ে নেমে এসেছে সমতল-ভূমিতে। এই সমতলের প্রস্থ স্থানে স্থানে কিছু অধিক হলেও প্রায় ক্ষেত্রেই সংকীর্ণ। কোথাও কোথাও সবুজ শস্য ক্ষেত্রের চিহ্ন, কোথাও বা ক্ষুদ্র বৃহৎ শিলা-খণ্ডে আকীর্ণ। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র। তরঙ্গিত বালির পাহাড় দিগন্তের কোলে গিয়ে মিশেছে।

জলের পাত্রটি পূর্ণ করে কুমারায়ণ ওপরের দিকে তাকাতেই একটি দৃশ্য তার চোখের সামনে ফুটে উঠল।

সন্ধ্যার আবছায়ায় কালো হয়ে আসা পর্বতের একটি অংশে হঠাৎ দেখা গেল কয়েকটি আলোর কমল। ঐ কমলগুলি ছিন্ন মালার আকারে ওপর থেকে নিচে অন্ধকারের স্রোতে ভেসে আসছিল। কখনো দৃষ্টির আড়ালে ডুবে যাচ্ছিল আবার কখনো ভেসে উঠছিল চোখের ওপর।

এক সময় হারিয়ে গেল সেই আলোর কমলগুলি। অন্ধকারে প্রস্তরাকীর্ণ পথে আস্তানার সম্মুখে মশালের সংকেত দেখে ফিরে এল কুমারায়ণ।

বণিকদের ভেতর অনেকেই পাহাড়ের ওপর সচল আলোর মালাটিকে দেখেছিল। তারা ঐ আলোর সম্ভাব্য উৎস সম্বন্ধে আলোচনা করছিল। কুমারায়ণ অভিজ্ঞ বণিকদের কথা থেকে জানতে পারল, তারা এখন ভরুক অঞ্চলের কোনো একটি স্থানে রয়েছে। এই পথেই ভরুক ছাড়িয়ে কিজিল ও কুচী নগরীতে যেতে হবে। (ভরুক, কিজিল ও কুচী মধ্য এশিয়ার প্রাচীন জনপদ)।

জনৈক বণিক বলল, ভরুকে সম্ভবত কোন উৎসব চলেছে, তারই আলো ওটা।

অন্যজন বলল, এমনও তো হতে পারে আমাদের চেয়ে অনেক বড় কোনো দল রাতে ওপরের শৈলশিরায় মশাল জেবলেছে।

দলপতি মন্তব্য করলেন, উৎসবের আলো হওয়াই সম্ভব। বৈশাখী পূর্ণিমা, বুদ্ধ তথাগতের জন্মতিথি। গত পরশ্ব পূর্ণিমা গেছে, হয়তো উৎসবের জের চলেছে আজও।

সহসা কুমারায়ণের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। প্রভু বুদ্ধের জন্মোৎসব এখানে! ভারতবর্ষ থেকে এত দূরে!

সে প্রশ্ন করল, এসব অঞ্চলের মানুষ কি প্রভু অমিতাভকে এমনভাবে স্মরণ করে! ঠিক আমরা যেমন ভারতবর্ষে? দলপতি অনভিজ্ঞ যুবকটিকে বললেন, দক্ষিণে শূলি (কাশগড়), চোক্কুক (ইয়ারকন্দ), গোদান (খোটান) আর উত্তরে ভরুক (ইয়াক-আরিক্), কুচী (কুচা), অগ্নি দেশ (কারাশর) বহুকাল আগেই প্রভু বুদ্ধের শরণ নিয়েছে।

যুবক নিজেও সম্প্রতি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছে। পণ্ডিত বংশের সন্তান সে। বেদ, উপনিষদের শিক্ষায় শিক্ষিত। অন্যদিকে পালি ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত বৌদ্ধ শাস্ত্রগুলি অধ্যয়ন করেছে তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সে শুনেছে একাধিক ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুর কথা, যাঁরা ভারত ছেড়ে বহু দূর দূরান্তে বুদ্ধের বাণী বহন করে নিয়ে গেছেন।

নিজের পরিচয় এই সার্থবাহ দলটির কাছে গোপন রেখেছিল কুমারায়ণ। তারা শুধু জানত, দেশ-দর্শনে আগ্রহী এক যুবক তাদের সঙ্গ নিয়েছে।

সারাদিন পথ অতিবাহনে বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল বণিকেরা। রাতের শুরুতেই আহার্য দ্রব্য গ্রহণ করে শয্যার আশ্রয় নিল। অচিরেই তন্দ্রার গভীরে তলিয়ে গেল তারা।

কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া তিথির অবগুণ্ঠন সরিয়ে চাঁদ উঁকি দিয়েছে আকাশে। নির্জন, নিঃশব্দ চরাচর। পর্বতের শৃঙ্গগুলি তুষারের মুকুট মাথায় পরে সারিবদ্ধভাবে বসে রয়েছে স্বয়ম্বর সভায় সমাহূত রাজন্যবর্গের মত। সভায় প্রবেশ করে চাঁদ এখন পরিক্রমণ করছে তাদের।

ঘুম ভেঙে গেল কুমারায়ণের। গায়ে কপিশবর্ণের পশমী উত্তরীয়খানা জড়িয়ে নিয়ে পটাবাসের (তাঁবু) বাইরে এসে দাঁড়াল সে। বৈশাখ মাস, কিন্তু নিশীথকালে এ সকল অঞ্চলে শীত প্রবল। তিন দিক ঘিরে তুষার পর্বত, সামনে বালুকা স্তূপ। বালির স্তূপগুলি আশ্চর্য রহস্যময় হয়ে উঠেছে। কুমারায়ণকে সমস্ত প্রকৃতি তাদের কাছে গিয়ে বসার জন্য আকর্ষণ করতে লাগল।

পটাবাসের অভ্যন্তরে গিয়ে কুমারায়ণ সন্তর্পণে নিজের সুষিরটি (বাঁশি)

নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়াল গত সন্ধ্যার সেই স্রোতস্বতীটির কাছে। গ্রীষ্মকালে পর্বতের তুষার গলে গিয়ে নদী, ঝর্ণা জলে পুষ্ট হয়ে ওঠে। কুমারায়ণ দেখল ঝর্ণাটি উচ্ছল নটীর মত পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে নৃত্য করতে করতে নেমে আসছে নীচে। চন্দ্রালোকে জলকণাগুলি নটীর দেহে হীরে মুক্তার অলঙ্কারের মত ক্ষণে ক্ষণে ঝলসে উঠছে! আবার ঝর্ণাটি সমতলে এসে পূর্ব দিকের বালুপ্রান্তরে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

কুমারায়ণকে ঐ নৃত্যপটিয়সী ঝর্ণা প্রবলভাবে আকর্ষণ করতে লাগল। এ যেন এক কুহকিনী কিন্নরী, পথিককে সম্মোহিত করে দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেল।

কুমারায়ণ ওষ্ঠে বাঁশিটি তুলে নিয়ে ফুঁ দিলে। সঙ্গে সঙ্গে এক আশ্চর্য কম্পন রাত্রির নিস্তব্ধতাকে ভেদ করে জ্যোৎস্নার তরঙ্গে প্রবাহিত হতে লাগল।

কুমারায়ণ কিন্তু কোথাও উপবেশন করল না, সে ঝর্ণার জলধারার পথ ধরে বাঁশি বাজাতে বাজাতে এগিয়ে চলল।

কিছুদূরে গিয়ে এক বালির পাহাড়ের মুখোমুখি হল কুমারায়ণ। সঙ্গের স্রোতোধারাটি ঐ বালুকারাশির অভ্যন্তরে কোথাও আত্মগোপন করেছে বলে মনে হল। সে বাঁশি থামিয়ে উঠতে লাগল বিশাল বালুর স্তূপের ওপর।

ওপরে উঠে আশ্চর্য হয়ে গেল কুমারায়ণ। এতক্ষণ বালির পাহাড় যাকে চোখের আড়াল করে রেখেছিল সেটি একটি মরূদ্যান। যে জলধারাটি লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল বালুকা স্তূপের মধ্যে তাকে এপারে দেখা গেল। অন্তঃসলিলা ধারায় সে সৃষ্টি করেছে একটি জলাশয়। সেই জলাশয়ের চারদিক ঘিরে খর্জুর বৃক্ষ শোভা পাচ্ছে। খর্জুরকুঞ্জের পরেই একটি নাতিক্ষুদ্র প্রান্তর। কি আশ্চর্য! ওখানে দুটি শুভ্র পটাবাস আলোর সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে আছে। সহসা চোখে তাদের অস্তিত্ব ধরা পড়া দুষ্কর।

আকাশে নক্ষত্রের দিকে একবার তাকাল কুমারায়ণ। রাত্রি প্রভাত হতে আর বেশি বাকী নেই। পূবের আকাশে শুকতারার উদয় হয়েছে।

প্রথমে কুমারায়ণের মনে হল, তাদেরই মত কোন বণিকের দল এই মরূদ্যানে এসে রাতের আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু গভীরভাবে নিরীক্ষণ করে দেখতে গিয়ে সে আতঙ্কে প্রায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। প্রান্তরে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়ে আছে কতকগুলি মানুষ। খর্জুর বৃক্ষের অন্তরাল দিয়ে যতটুকু দেখা গেল তাতে মনে হল তাদের কারও দেহেই প্রাণ নেই।

কুমারায়ণ দুর্জয় সাহসী যুবা হলেও মুহূর্তের জন্য কে যেন তার সমস্ত মানসিক শক্তিকে নিঃশেষ করে দিয়ে গেল। সে একবার ভাবল, যে পথে এসেছে সেই পথে নিঃশব্দে ফিরে যাবে। কিন্তু পরক্ষণেই তার সাহস ও কৌতূহল একসঙ্গে ফিরে এলো। সে বালির পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচে নামল। নিস্তরঙ্গ জলাশয়ে স্তব্ধ হয়ে চাঁদ কি যেন দেখছে। খর্জুর বৃক্ষগুলি দাঁড়িয়ে অশরীরী আত্মার মত নিজেদের ছায়াগুলোর দিকে চেয়ে আছে।

দুটি খর্জুর বৃক্ষের অন্তরাল থেকে কুমারায়ণ সবকিছু দেখতে লাগল। হ্যাঁ, তার অনুমানই সত্য। পাঁচ ছ'জন মানুষের ছিন্নভিন্ন দেহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে। সবার পরণে নৈশ পোশাক। কয়েকটি অস্ত্র চন্দ্রালোকে ধাতব দীপ্তি ছড়াচ্ছিল।

এই রহস্যময় দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে কুমারায়ণের মনে হল, এরা পরস্পর যুদ্ধ করে নিহত হয়নি। কারণ বিক্ষিপ্ত অস্ত্রগুলিতে কোনরূপ রক্ত-চিহ্ন নেই। তাহলে এই হত্যাকাণ্ড কিভাবে সংঘটিত হল? আকস্মিকভাবে কোনো শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হওয়াই সম্ভব। নিজেরা প্রত্যাঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হবার আগেই নিঃশেষ হয়েছে।

এর পরের চিন্তা কুমারায়ণকে ভাবিয়ে তুলল। এরা কারা? কোনো বণিক দলের কাছে এ ধরনের দীর্ঘ তরবারি থাকা সম্ভব নয়। তরবারিগুলি কোষমুক্ত হলেও অতর্কিত আক্রমণে হাত থেকে স্খলিত হয়ে পড়েছিল। এরাও নিঃসন্দেহে যোদ্ধা, তবে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন ছিল না।

চতুর্দিক নিস্তব্ধ। প্রাণের কোনো লক্ষণই দৃষ্টিগোচর হল না কুমারায়ণের। কোন শত্রু প্রাণ সংহারের জন্য ওঁৎ পেতে আত্মগোপন করে আছে বলে মনে হল না।

কুমারায়ণ খর্জুর বৃক্ষের অন্তরাল থেকে প্রান্তরের দিকে পা বাড়াতে যাচ্ছিল এমন সময় তীক্ষ্ন হ্রেষাধ্বনি কানে এলো। থেমে গেল কুমারায়ণ। সে চতুর্দিকে তাকিয়ে অশ্বের অবস্থান সম্বন্ধে জানবার চেষ্টা করতে লাগল।

জলাশয়টিকে খর্জুরকুঞ্জে বেষ্টন করেছিল। যেদিকে প্রান্তর তাব বিপরীত দিকে একটি নাতি-উচ্চ বালুকাস্তূপ। ঐ স্তূপের ওপার থেকেই শব্দটা ভেসে আসছিল বলে মনে হল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর যখন আর কোনো শব্দ ভেসে এলো না তখন কুমারায়ণ অতি সন্তর্পণে ঐ শব্দের পথ অনুসরণ করে চলতে লাগল। খর্জুরকুঞ্জ পার হয়ে এসে বালুকা স্তূপের ওপর আরোহন করল সে। আর একটি বিস্ময় তার চোখের উদ্ঘাটিত হল। যে স্রোতোধার সুউচ্চ বালির পাহাড়ের তলা দিয়ে অন্তঃসলিলা হয়ে জলাশয়টি সৃষ্টি করেছে, সেটি ক্ষীণ ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে এপারে। সেই ধারার পাশেই একটি অতি সুদৃশ্য পটাবাস। আকারে ক্ষুদ্র। বাইরে থেকে এর অবস্থান নির্ণয় সহজ নয়। পটাবাসের সামনে দাঁড়িয়ে একটি শ্বেত অশ্ব। আর ঐ অশ্বটির অদূরে জলধারার পাশে পড়ে রয়েছে এক তরুণী। কুমারায়ণের মনে হল, এই বালির স্তূপ থেকেই মেয়েটি ওখানে গড়িয়ে পড়েছে। কারণ বালির একটি অংশে ভারী কোন বস্তুর গড়িয়ে পড়ার চিহ্ন বর্তমান।

এখন কুমারায়ণের চিন্তা এলো, মেয়েটি জীবিত কি মৃত! যে কোন কারণেই হোক মেয়েটি গড়িয়ে পড়েছে বালির স্তূপ থেকে। কিন্তু ঐ গড়িয়ে পড়াই তার মৃত্যু কিংবা মূর্ছার কারণ হতে পারে না।

কুমারায়ণ আর কোনো দ্বিধা না করে নেমে গেল নীচে। মেয়েটির কাছে গিয়ে সে পরীক্ষা করে দেখল, না, মেয়েটির মৃত্যু হয়নি। শ্বাসপ্রশ্বাস বইছে। শ্রেষ্ঠ শিল্পীর হাতে গড়া মূর্তির মত মুখখানিতে লেগে আছে ভয়ঙ্কর আতঙ্কের ছায়া।

কুমারায়ণ জলধারা থেকে জল তুলে মেয়েটির চোখে মুখে ছিটিয়ে দিতে লাগল। বরফগলা অত্যন্ত শীতল জলের স্পর্শে মেয়েটি অচিরে চোখ মেলে তাকাল। সে চোখে তখনও বিহ্বলতার ঘোর। কিন্তু কুমারায়ণ তরুণীর অবয়বের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত! শুভ্রবর্ণ, স্বর্ণাভ কেশ আর নীল আঁখির তারায় তরুণীকে ভিন্ন জগতের মানবী বলে মনে হল তার।

তুষারশীতল জলের ছোঁয়ায় কয়েকবার কম্পিত হল তরুণীর দেহ। ধীরে ধীরে সে উঠে বসল নিজের শক্তিতে।

সহসা সামনে কুমারায়ণকে দেখে তার চোখে মুখে ফুটে উঠল আতঙ্কের ছায়া। সে পালাবার চেষ্টা করল কিন্তু দুর্বল দেহটাকে বেশী দূর টেনে নিয়ে যেতে পারল না, আবার মাটিতে পড়ে গেল।

কুমারায়ণ আশ্বাস দিয়ে বলে উঠল, ভয় পাবেন না, আমি আপনার শত্রু নই, মিত্র। কি আশ্চর্য! কুমারায়ণের ঐ কটি কথা মন্ত্রের মত কাজ দিল।

তরুণীর গলা আবেগে কেঁপে উঠল, প্রভু বুদ্ধের জয় হোক, তিনিই এখানে আপনাকে পাঠিয়েছেন।

কিন্তু আশ্বাসের কথাকটি কুমারায়ণ উচ্ছ্বাসে উচ্চারণ করে গেলেও তরুণীটি যে তার ভাষা বুঝতে পারবে তা সে ভাবতেই পারেনি। তক্ষশীলায় প্রচলিত গান্ধার অঞ্চলে প্রাকৃতে সে কথাগুলো বলছিল। তরুণী প্রায় সমান কুশলী উচ্চারণে গান্ধার-প্রাকৃতেই জবাব দিল।

তরুণীর ভারতীয় ভাষার জ্ঞানে বিস্মিত হলেও এই মুহূর্তে কুমারায়ণের মনে হল মেয়েটিকে সামনের পটাবাসে নিয়ে যাওয়া দরকার।

সে এগিয়ে গিয়ে অসংকোচে মেয়েটির হাত ধরে বলল, চলুন, আমি আপনাকে ঐ পটাবাসের (তাঁবু) মধ্যে প্রবেশ করতে সাহায্য করি।

মেয়েটি তাকাল কুমারায়ণের মুখের দিকে। সে মুখে পৌরুষের দীপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য একধরনের সহৃদয় কমনীয়তা মাখান। সে কুমারায়ণের হাত ধরে উঠে দাঁড়াল। দুজনে প্রবেশ করল পটাবাসের মধ্যে।

অতি সুসজ্জিত অভ্যন্তর। শয্যা ও উপবেশনের স্থান নানা বর্ণের চীনাংশুকে আচ্ছাদিত। গবাক্ষপথে চন্দ্রালোকে সবই উদ্ভাসিত।

নিজে শয্যায় এলিয়ে বসে পাশের আসনে উপবেশনের জন্য ইঙ্গিত করল কুমারায়ণকে।

কুমারায়ণ বসলে তরুণীর প্রথম প্রশ্ন, আপনি কি বলতে পারেন প্রান্তরে যে শিবির রয়েছে তার কি খবর? আমি বলতে চাইছি, আমার রক্ষীদের কেউ বেঁচে

আছে কি ? উঃ কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য !

কুমারায়ণ বলল, আপনি স্থির হয়ে বিশ্রাম করুন, বিচলিত হবেন না। আমার মনে হয় তাদের কেউ আক্রমণকারীদের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারেনি। আবার আপনি বিচলিত হচ্ছেন, স্থির হয়ে বসুন।

মেয়েটি কিছু সময় নীরব থেকে আবার বলল, আমার দুটি তরুণী পরিচারিকাকে ওরা আমাদের ঘোড়ার চড়িয়ে নিয়ে গেছে। আমার ঘোড়াটি ছাড়া সবকটিই ওরা নিয়ে গেছে।

আপনার আস্তানার সন্ধান ওরা নিশ্চয়ই পায়নি ?

আমি রাতে এখানে পেঁাছে রক্ষীদের আড়ালে থাকব বলে এই স্থানটি নির্বাচন করেছিলাম।

আপনার নির্বাচন আপনাকে রক্ষা করেছে। আচ্ছা, কারা এই আক্রমণ চালিয়েছিল তা আপনি অনুমান করতে পারেন ?

আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল রক্ষীদের চীৎকারে। তারা হুন-হুন বলে চেঁচাচ্ছিল।

তারপর ?

তরুণী উত্তেজনায় শয্যার ওপর সোজা হয়ে উঠে বসল। তার দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস কুমারায়ণ শুনতে পাচ্ছিল।

আমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে বালির ঐ স্তূপটার ওপর উঠলাম। উঁকি দিয়ে যা দেখলাম তাতে আমার সমস্ত শরীর হিম হয়ে গেল। আমার কয়েকজন রক্ষীর ছিন্ন-ভিন্ন দেহ পড়ে আছে। আমার পরিচারিকাদের আকুল কান্নার স্বর আমি শুনতে পাচ্ছিলাম। ওদের তখন ঘোড়ায় তোলা হয়েছে। আর আমাদের সমস্ত ঘোড়াগুলোও তখন ওদের হেফাজতে। ওরা প্রান্তর পেরিয়ে বায়ুকোণ ধরে চলতে লাগল।

কথা বলতে বলতে এখানে একটু থামল মেয়েটি। আবার কথা যখন শুরু করল তখন গলায় লেগেছে আতঙ্কের সুর।

ঠিক ওদের চলে যাবার মুহূর্তে ঐ খর্জুর কুঞ্জ থেকে একটি শর নিক্ষিপ্ত হল। আমারই কোন রক্ষী লুকিয়ে থেকে ঐ শর নিক্ষেপ করে থাকবে। শরটি হুন সর্দারের বাহু বিদ্ধ করল। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে দাঁড়াল সমস্ত দলটা। চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল জায়গাটা। শর নিক্ষেপ করেই রক্ষীটি বালির পাহাড় ডিঙিয়ে পালাবার চেষ্টা করছিল কিন্তু বালি ভেঙে পালাবার আগেই ধরা পড়ে গেল। তাকে সর্দারের আদেশে বেঁধে ফেলল হুনেরা। তারপর ঐ পাহাড়ের বালি অনেকখানি সরিয়ে লোকটিকে জ্যান্ত ওর মধ্যে শুইয়ে মণ মণ বালি চাপা দিয়ে দেওয়া হল। আমি সেই মুহূর্তেই মনে হয় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে নীচে গড়িয়ে পড়েছিলাম। আর কিছু মনে নেই।

কুমারায়ণ বলল, আমি খর্জুর বৃক্ষের আড়াল থেকে যতটুকু দেখেছি তাতে

মনে হয় জীবিত আর একজনও কেউ ঐ প্রান্তরে নেই। তবু আপনি এখানে অপেক্ষা করুন, আমি চারদিক একবার ভাল করে দেখে আসছি।

মেয়েটি সহসা বলে উঠল, আপনি আমাকে দয়া করে ফেলে যাবেন না। এই শবের শ্মশানে আমি দম বন্ধ হয়ে মারা যাব।

কুমারায়ণ আশ্বাস দিয়ে বলল, আমার অনুমান আপনি বুদ্ধের ভক্ত। আমার সঙ্গে প্রথম বাক্যালাপেই আপনি প্রভুর নাম উচ্চারণ করেছিলেন। আমি তাঁরই দেশের মানুষ, তাঁরই নির্দেশে পথ চলি। আপনি নির্ভয়ে থাকুন। আমি আমাদের বণিকদলকে সংবাদ দিয়ে এখুনি এখানে নিয়ে আসছি।

তরুণীটি বলল, দয়া করে অধিককাল বিলম্ব করবেন না।

কুমারায়ণ বাইরে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি এখুনি আসছি।

কুমারায়ণ প্রথমে পার্শ্ববর্তী প্রান্তরে, শিবির মধ্যে অনুসন্ধান করে দেখল, কেউ কোথাও আছে কিনা, তারপর সব শূন্য দেখে সে নিজের আস্তানার দিকে ফিরে চলল।

শেষ রাত্রে বণিকদলের প্রায় সকলেই শয্যা ত্যাগ করেছিল। কুমারায়ণকে শয্যায় দেখতে না পেয়ে ভাবছিল, খেয়ালী যুবক নিশ্চয়ই নিকটবর্তী কোন স্থানে গিয়ে থাকবে। এখুনি এসে পড়বে সে, কারণ ভোরের যাত্রার জন্য তৈরি হয়ে নিতে হবে তাদের।

কুমারায়ণ এলো, কিন্তু অন্য মুখচ্ছবি। উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা, হাঁপাচ্ছিল।

দলপতি উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, কি খবর কুমারায়ণ, কোথায় গিয়েছিলে? এমন চেহারাই বা হয়েছে কেন?

কুমারায়ণ বালির পথ ভেঙে দৌড়ে আসার জন্যই হাঁপাচ্ছিল। সে বণিকদের কাছে রাতে শিবির ছেড়ে যাবার পর থেকে যে সব ঘটনা ঘটেছিল তার আনুপূর্বিক বর্ণনা দিয়ে গেল।

মুহূর্তে দলপতি ও অন্যান্য বণিকদের মুখে চোখে আতঙ্কের ছায়া ঘনিয়ে উঠল। দলপতি সঙ্গে সঙ্গে আদেশ করলেন, তাঁবু তোল। হুনেরা এই অঞ্চলেই কোথাও রয়েছে। আমরা কুচী রাজ্যে না গিয়ে ফিরে যাব বহ্লীকে।

কুমারায়ণ বলল, তাহলে আপনারা কিছু সময় অপেক্ষা করুন, আমি ঐ অসহায় মেয়েটিকে নিয়ে আসছি।

দলপতি কঠিন স্বরে বললেন, আমরা বণিক, ব্যবসায়ে লাভ করাই আমাদের উদ্দেশ্য, লোকসান নয়, যুবক। এত পথ পরিশ্রম করে এলাম লুণ্ঠিত হবার জন্যে? মুহূর্ত বিলম্ব নয়, যাবার জন্য তৈরি হও।

দেখতে দেখতে বোঝাগুলি তৈরি হয়ে গেল। কয়েকটি অশ্বেতর দাঁড়িয়েছিল, ভারী বোঝাগুলি তাদের ওপর চাপান হল। অতি দ্রুত এবং নিঃশব্দে কাজ শেষ হলে দলপতি দক্ষিণ-পশ্চিমে চলার আদেশ দিলেন।

কুমারায়ণ এতক্ষণ অন্যান্য বণিকদের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছিল, এখন দলপতির মুখে চলার আদেশ পেয়ে সে থমকে দাঁড়াল।

দলপতি চলার জন্য পা বাড়িয়েই থেমে গেলেন।

কি হল তোমারা দাঁড়ালে যে?

আপনার কাছে আমি অশেষ ঋণে ঋণী, কিন্তু বিবেককে বিসর্জন দিয়ে আত্মরক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনারা ব্যবসায়ী, আপনাদের পথ ভিন্ন, কিন্তু আমি সাধারণ ভ্রাম্যমাণ, আমার হারাবার কিছু নেই।

দলপতি বললেন, যুবক তোমার অভিজ্ঞতা অল্প, তার ওপর তুমি আবেগ-প্রবণ, তোমাকে আমি নিজের পথে চলতে বাধা দেব না। তবে পৃথিবী বড় কঠিন জায়গা, হিসেবের সামান্য ভুল হলেই বিপদে পড়বে। তোমার মঙ্গল হোক।

দলপতি আর কোনোদিকে না তাকিয়ে দ্রুত ধাবমান দলটির পশ্চাৎ অনুসরণ করে চললেন। তাঁর মনে কুমারায়ণের জন্য সঞ্চিত হয়েছিল কিছুটা অপত্য স্নেহ। যুবকটির আচরণ তৃপ্তিদায়ক, কর্তব্যজ্ঞান প্রবল, সকলের ওপর তার বংশীবাদনের ক্ষমতা অসাধারণ। ক্লান্ত দেহমনে তার বাঁশির সুর সুধার মত কাজ করে। কিন্তু এসব কথা ভাবলে দলপতির চলে না। সারা দলের শুভাশুভের কথা তাঁকে ভাবতে হয়। একটি যুবকের ইচ্ছা পূরণের জন্য এতগুলি মানুষেব বিপদের ঝুঁকি নেওয়া যায় না। তাঁর এই দীর্ঘ বণিক জীবনে কত মানুষ তিনি দেখেছেন। সাধুবেশে সঙ্গী হয়ে মহা মূল্যবান মনিরত্ন লুণ্ঠন করে পালিয়েছে। তাছাড়া দস্যুর মুখোমুখি হয়ে কত বণিক দলকে তিনি দেখেছেন ধনেপ্রাণে নিঃস্ব হয়ে যেতে।

দলটি পথের বাঁকে অদৃশ্য হলে কুমারায়ণ সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। এখন এই অজ্ঞাত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে সে একা। পথ জানে না, আহার্য কিভাবে সংগ্রহ করা যাবে তাও সে জানে না। সামনে শুধু একটুকরো কর্তব্যের আলো তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

কুমারায়ণ যখন মরূদ্যানে ফিরে এলো তখন প্রভাতের আর বিলম্ব ছিল না। মরুচর পাখির দল বৃক্ষশাখায় বসে প্রভাতী কলরবে মেতে উঠেছিল। নীল দিগন্তে ভোরের আভাস। হিরকখণ্ডের মত তখনও জ্বল জ্বল করে জ্বলছে শুকতারা।

প্রভাতের এই প্রসন্ন আয়োজনের মধ্যেও একটা বীভৎস দৃশ্য কুমারায়ণের মনকে অস্থির করে তুলল। সে এই নারকীয় পরিস্থিতির হাত থেকে কতক্ষণে মুক্তি পাবে সেই চিন্তা করতে করতে দ্বিতীয় বালির স্তূপটি পেরিয়ে তরুণীর আস্তানায় এসে ঢুকল।

শয্যায় হতচেতন হয়ে পড়েছিল তরুণীটি! রাত্রি জাগরণে আর শঙ্কায় সে একটা ঘোরের মধ্য দিয়ে চলেছিল। কুমারায়ণ শীতল জলের স্পর্শে তাকে জাগিয়ে তুলল। তরুণী শয্যায় উঠে বসে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল

কুমারায়ণের মুখের দিকে। সে যেন রাতের বীভৎস হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি দেখছিল ভয়ঙ্কর একটা স্বপ্নের ঘোরে। সকালে উঠে সব মিথ্যে হয়ে যাবে এই ছিল তার আশা। কিন্তু রাতের স্বপ্নের শেষ পর্বে সে যে মানুষটিকে দেখেছিল সেই মানুষটিই যেন দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে।

বিহ্বলতা তখনও কাটেনি। সে জিজ্ঞেস করল, কে ? কে আপনি ?

কুমারায়ণ বুঝল, এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে মেয়েটির ভাবান্তর অস্বাভাবিক নয়। সে অত্যন্ত কোমল গলায় বলল, আপনি বিচলিত হবেন না, আমি আপনার বন্ধু। কিছুক্ষণ আগে আমি আপনার কাছেই ছিলাম।

মেয়েটি এতক্ষণে কিছুটা স্বাভাবিক হল। তার সব ঘটনা দৃশ্যের পর দৃশ্য মনে পড়ে গেল। সে উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, আপনি আপনার বণিক দলটিকে এখানে নিয়ে আসবার জন্যে গিয়েছিলেন না ?

তাঁরা কোথায় ?

তারা চলে গেছে।

কি সর্বনাশ ! আপনাকে ফেলে। আমিই দেখেছি আপনার বিপদের কারণ হলাম।

আপনি হঠাৎ এসে এখানে আটকে না পড়লে এ অঘটন কিছুতেই ঘটত না।

মেয়েটির উদ্বেগ দূর করে সহজ গলায় কুমারায়ণ বলল, আপনার সঙ্কোচের কোনো কারণ নেই জানবেন। আমি একটি বণিক দলের সঙ্গী হয়ে পড়েছিলাম ঠিকই কিন্তু আমি ওদের দলের কেউ ছিলাম না। নিছক দেশ ভ্রমণের জন্যেই আমি বেরিয়েছিলাম। পথে বণিক দলটির সঙ্গে আমার পরিচয়। পথের পরিচয় পথেই শেষ হয়ে গেল। দায় রইল না কোনো পক্ষেরই।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে কি যেন ভাবল মেয়েটি। এক সময় মুখ তুলে ধীরে ধীরে বলল, এখন আপনি কোথায় যাবেন, কি করবেন, কিছু ভেবেছেন কি ?

আমাদের প্রথম কাজ হবে এই মৃত্যুপুরী থেকে এখুনি বেরিয়ে পড়া। তারপর পথেই ঠিক করা যাবে গন্তব্য।

ওরা মরূদ্যান ছেড়ে বেরিয়ে যাবার আগে মৃতদেহগুলি সমাহিত করল। পর্যাপ্ত খাদ্য সঙ্গে নিল আর চর্মাধারে ভরে নিল পানীয়। অশ্বটির পিঠে প্রয়োজনীয় দ্রব্য চাপিয়ে দিল।

পথে নেমে কুমারায়ণ বলল, আমাদের প্রথম প্রয়োজন দুজনের নাম জেনে নেওয়া, তারপর যাত্রার দিক নির্ণয় করা। আমাকে আপনি কুমারায়ণ বলে ডাকবেন।

আমি জীবা।

বিস্মিত হল কুমারায়ণ। মেয়েটির আকৃতির সঙ্গে ভারতীয়দের অনেক পার্থক্য, কিন্তু নামের মধ্যে এতখানি মিল, আশ্চর্য।

তার মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন দেখে মেয়েটি বলল, আপনার ভাষা শুনে বুঝে-

ছিলাম আপনি ভারতীয়। আমার দীক্ষাগুরুও ছিলেন আপনার দেশেরই লোক। তিনিই আমার জন্মের পর জীবা নামকরণ করেছিলেন।

আপনি কোন রাজ্যের অধিবাসী জানতে পারি কি ?

মেয়েটি ক্ষণকাল কি ভাবল। সম্ভবত সে তার পুরো পরিচয় দেবে কিনা ভাবছিল। সে শুধু বলল, কুচী রাজ্যে আমার বাস।

কি আশ্চর্য ! আমি যে বণিকদলের সঙ্গে ছিলাম তারাও কুচী রাজ্য লক্ষ্য করে চলেছিল।

জীবার মুখে চিন্তার ছায়া ঘনিয়ে উঠল। সে বলল, তাহলে তো ওদের মুখে আমাদের বিপর্যয়ের খবর কুচী রাজ্যে পেঁৗছে যাবে।

কুমারায়ণ বলল, যদিও আমি আপনাদের বিপর্যয়ের কথা সবিস্তারে বণিকদের কাছে বলেছি তবু কুচী রাজ্যে এই মুহূর্তে খবর পেঁৗছানোর সম্ভাবনা কম।

একথা কেন বলছেন ? ওরা কুচীতে গেলে কথায় কথায় খবর নিশ্চয়ই ছড়িয়ে পড়বে।

আমার মুখে বণিকেরা হূন দস্যুদের খবর পেয়েই পথ বদলে বাহ্লীকের দিকে চলে গেছে।

জীবা বলল, এখন তাহলে আমরা কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে যাত্রা করতে পারব।

কুমারায়ণ সামান্য চিন্তা করে নিয়ে বলল, দক্ষিণ-পশ্চিমে কেন ? আপনার কুচী রাজ্য তো ওদিকে নয়।

আমরা কুচী থেকে গোদানের (খোটান) দিকে যাচ্ছিলাম। ঐ দিকেই এখন যাবার ইচ্ছে। আপনার কি ওদিকে যাবার অসুবিধে আছে ?

দিকবিদিকে ঘোরার বাসনা নিয়েই বেরিয়েছি, আমার কাছে সব দিকই সমান মূল্যবান।

তবু চলুন গোদানের দিকেই যাই।

কুমারায়ণ সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে বলল, চলুন, তবে পথের নিশানা তো আমার জানা নেই।

আমিও এই প্রথম গোদানে চলেছি, তবে এ পথের কথা গুরু ধর্মমতির মুখ থেকে বহুবার শুনেছি। আগে ধর্মমতি কুচীতেই ছিলেন। গোদানের মহারাজা অমিত্রবিজয় কুচীর মহারাজকে অনুরোধ জানিয়ে গুরু ধর্মমতিকে গোদানে নিয়ে গেছেন। সেখানে তিনি বিখ্যাত গোমতীবিহারে মহাশ্রমণের পদ অলঙ্কৃত করেছেন। গুরু ধর্মমতি কুচীকে ভুলতে পারেননি তাই বৎসরান্তে একটিবার এসে দেখা দিয়ে যান।

পথ চলতে চলতে কুমারায়ণ ও জীবার পরিচয় সহজ হয়ে উঠল।

কুমারায়ণ বলল, আপনার গোদানে যাবার বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য আছে কি ?

গোদানে 'বুদ্ধযাত্রা' উৎসব দেখার জন্যেই আমি বেরিয়েছি। অবশ্য গুরু

ধর্মমতির সঙ্গেও সাক্ষাতের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

গত সন্ধ্যায় পাহাড়ের ওপর থেকে আলোর একটি মালাকে নীচে নেমে আসতে দেখেছিলাম, আমাদের দলপতির অনুমান ভরুকের কোথাও বুদ্ধ উৎসব চলেছে, তারই আলো।

জীবা বলল, সূর্যাস্তের কিছু পরে ডানদিকের ঐ পাহাড় অঞ্চলটায় দেখে-ছিলেন কি?

আপনার অনুমান ঠিক। আলোর একসারি পদ্ম যেন অন্ধকারের স্রোতে ভেসে আসছিল।

এখন শূলি, চোক্কুক, গোদান, ভরুক, কুচী, অগ্নিদেশের সর্বত্র চলেছে বুদ্ধ উৎসব, কিন্তু গত সন্ধ্যার ঐ আলোটি উৎসবের ছিল না।

কুমারায়ণ বলল, তবে কি কোনো বণিক দলের জ্বলন্ত মশাল দেখেছিলাম?

হ্যাঁ, মশালের আলোই দেখেছিলেন তবে সেগুলো কোন বণিকদলেব হাতে ছিল না।

বিস্মিত কুমারায়ণ জিজ্ঞেস করে, তবে?

আমরাই পাহাড় থেকে নামছিলাম। আমাদের হাতেই মশাল ছিল। সন্ধ্যার আগেই ঐ মরূদ্যানে নেমে আসবার কথা। কিন্তু পথে সামান্য বিপর্যয়ে আমাদের বিলম্ব হয়ে যায়। আর ঐ বিলম্বই আমাদের কাল হল।

এ কথার অর্থ একটু পরিষ্কার করে বলুন।

এখন আমার অনুমান হূন দস্যুরা দূর থেকে আমাদের ঐ আলো দেখতে পায়। তারা আমাদের অনুসরণ করে মরূদ্যানের কাছাকাছি আত্মগোপন করে থাকে। রাতে রক্ষীরা তাঁবুর মধ্যে নিদ্রা গেলে চাঁদের আলোয় হূনেরা অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। পালাক্রমে রক্ষীদের পাহারা দেবার রীতি। যে রক্ষীটি প্রহরায় নিযুক্ত ছিল, তারই মুখ দিয়ে হূন-হূন চীৎকার বেরিয়ে আসে। আমি সেই শব্দে জেগে উঠেছিলাম।

কুমারায়ণ জানতে চাইল, কোনো মূল্যবান বস্তু দস্যুরা অপহরণ করে নিয়ে গেছে কি?

জীবা ম্লান মুখে বলল, সবচেয়ে মূল্যবান যে বস্তু অপহরণ করে নিয়ে গেছে তা হল তাজা কয়েকটি প্রাণ। তার পরের মূল্যবান বস্তু জীবন্ত দুটি তরুণী।

একটু থেমে আবার জীবা বলল, আপনি কি মণিরত্ন কিছু লুণ্ঠিত হয়েছে কিনা জানতে চান?

ততক্ষণে লজ্জায় মুখ আরক্ত হয়েছে কুমারায়ণের। সে বলল, আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি মণিরত্ন লুণ্ঠনের কথাই জানতে চেয়েছিলাম।

জীবা সহজ গলায় বলল, সেটাই স্বাভাবিক। তবে গুরুর দর্শনে যাচ্ছি তাই মণিরত্নের অলংকার সঙ্গে আনবার প্রয়োজন বোধ করিনি। অবশ্য গুরু-প্রণামীর স্বর্ণমুদ্রাগুলি আমার সঙ্গেই আছে। দস্যুরা তার হদিশ পায়নি।

দুদিন ওরা চলল সীতা নদীর একটি উপনদী ধরে। (প্রাচীন সীতা নদীটি বর্তমানে তারিম নদী আর তার উপনদীটি বর্তমানে ইয়ারকন্দ দরিয়া)। কখনো বিস্তীর্ণ বালুভূমি পথে পড়ল, কখনো পাহাড়ের পাদদেশে বনভূমি আর ফলকর বৃক্ষের উদ্যান।

কুমারায়ণকে এখন জীবা কুমার বলেই ডাকে। কুমারের বিচিত্র জীবন-কাহিনী, তার সুখ দুঃখের আগ্রহী শ্রোতা আর অংশীদার হতে ভাল লাগে জীবার।

কুমারায়ণ কথা আরম্ভ করে, শুনেছি, তোমাদের কুচী নগরীর রাজকুমারী পরমা সুন্দরী। অবশ্য তোমাকে দেখলে সে অনুমান সত্য বলে মনে হয়।

রাজকুমারীর খবর কোথায় পেলে কুমার?

সঙ্গী বণিকদের মুখ থেকে।

তারাও কি তোমার মত শুনেছে না নিজেদের চোখে দেখেছে রাজকুমারীকে?

দলপতি নাকি নিজের চোখে দেখেছে রাজকুমারীকে। শুধু রূপে নয়, গুণেও নাকি তিনি অনন্যা। বহু বিদ্যা তাঁর অধিগত। চতুর্দিকে তাঁর রূপ আর বিদ্যার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে।

জীবা বলে, আমার চেয়ে কুচীর রাজভগিনীকে বেশি কেউ জানে না।

রাজভগিনী বলছ কেন জীবা? উনি তো কুচীর মহারাজার কন্যা।

দুটিই সত্য কুমার। উনি রাজকন্যা ঠিক, তবে মহারাজার মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সিংহাসনের অধিকারী হয়েছেন, তাই তিনি এখন রাজভগিনী।

শুনেছি উনি অবিবাহিতা।

এ কথাও তোমার শোনা হয়ে গেছে?

শুনেছি আমাদের দলপতির মুখ থেকেই। আরও জেনেছি রাজকুমারীর বিয়ের আয়োজন চলেছে, আর সেজন্যে মূল্যবান মণিমুক্তা নিয়ে দলপতি কুচীর অভিমুখে যাচ্ছিলেন।

দুর্ভাগ্য রাজকন্যার, ভারতের লোভনীয় মণিমুক্তাগুলি তাঁর হাতছাড়া হয়ে গেল। শুনতে ইচ্ছে করে কি কি দ্রব্য ছিল বণিকের পেটিকায়। রাজভগিনীকে গিয়ে অন্তত সে সংবাদটুকু দিতে পারব।

কুমারায়ণ একটি একটি করে দ্রব্যের তালিকা পেশ করে যায়। দুর্লভ মুক্তা দিয়ে গাঁথা একটি মালা। বৈদূর্য ও ফিরোজামণির অলংকার। হীরকের একটি দর্শনীয় অঙ্গুরীয়।

অন্য কিছু? যা অলংকার নয় অথচ তৃপ্তিদায়ক।

তাও ছিল, কিন্তু সেগুলি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নয়।

তবে?

সেগুলি ছিল রাজভগিনীর বিবাহের উপহার।

দুর্ভাগ্য রাজভগিনীর, সেই উপহারগুলি থেকে তিনি বঞ্চিত হলেন। কি সে উপহার কুমার?

অতি সূক্ষ্ম একখণ্ড বস্ত্র যা অবগুণ্ঠনের মত ব্যবহার করলেও দেহের কিংবা পোশাকের স্বাভাবিক বর্ণকে আবৃত করবে না।

বিস্ময়কর !

শুধু তাই নয়, শিশিরসিক্ত তৃণের ওপর বিছিয়ে দিলে কেবল সবুজ তৃণগুলিই দেখা যাবে, বস্ত্র খণ্ডটি অদৃশ্য হয়ে যাবে দৃষ্টির সামনে থেকে।

আশ্চর্য !

আরও দুটি উপহার ছিল রাজভগিনীর জন্য।

কি সে উপহার ? যত শুনছি ততই হতাশ হয়ে পড়ছি বান্ধবীর কথা ভেবে। সত্যি বেচারার কি দুর্ভাগ্য। হাতের ধন দুরন্ত নদীর প্রবাহে পড়ে হারিয়ে গেল !

রাজভগিনী বুঝি তোমার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী জীবা ?

এতবড় বান্ধবী বোধকরি আর তার কেউ নেই। দেহ এবং আত্মায় আমরা নাকি অভিন্ন। রাজ্য শুদ্ধ সকলে এই কথা বলে।

এখন অন্য দুটি উপহারের কথা বলছি শোন : একটি চন্দন কাঠের ওপর খোদিত হরিণ-হরিণী। দুটি প্রাণী পরস্পর অন্তরঙ্গভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর ঠিক যেন মনে হচ্ছে তাদের নাভি থেকে সুবাস ছড়িয়ে পড়ছে।

জীবা চোখ বন্ধ করে বলল, বিশ্বাস কর কুমার আমি সেই হরিণ দুটিকে দেখতে পাচ্ছি। আর চন্দনের সুমিষ্ট সুবাস আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে আকুল করে তুলেছে।

আরও আছে জীবা, সেটিও কম আশ্চর্যজনক নয়।

কি সে বস্তু কুমার ?

একটি শুক পক্ষী। একবার তার সামনে কোনো কিছু উচ্চারণ করলে সে পরমুহূর্তে অবিকল সেই কথাগুলি উচ্চারণ করবে। পুরো চারছত্র গাথা একবার শুনলেই সে মনে রাখতে পারে।

জীবা মুখে বিস্ময়সূচক শব্দ করে গালে হাত রেখে বলল, এর চেয়ে বিস্ময়কর উপহার আর কি হতে পারে।

কুমারায়ণ বলল, রাজভগিনীর প্রতি ভাগ্যদেবতা প্রসন্ন হলে আরও বড় কিছু উপহার নিশ্চয়ই তিনি পেতে পারেন।

জীবা বলল, তাই যেন সত্য হয়। আমার সখী তোমার এ কথা শুনলে অত্যন্ত খুশি হতেন। এমন কি বক্তাকে পুরস্কৃতও করতেন।

কুমারায়ণ বলল, নাই বা দিলে তোমার সখীকে এসব সংবাদ। তিনি হয়তো দুঃখ পাবেন।

উপহারের কথা না বললে তিনি আরও বেশি দুঃখ পাবেন। কারণ কোনোদিনই পরস্পরের কাছে কোনো কথা আমরা গোপন করিনি।

তোমাদের বন্ধুত্ব যে কোনো মানুষের কাছে ঈর্ষার বস্তু। এমন আত্মার

সঙ্গে আত্মার মিলন সত্যিই দেখা যায় না। আচ্ছা জীবা, কুচীর রাজকন্যার বিবাহের কথা কি স্থির হয়ে আছে? আমি বলতে চাইছি কোনো বিশেষ ব্যক্তি কি নির্বাচিত হয়ে আছেন?

যদি বলি এখনও হয়নি তাহলে তুমিও কি অন্যতম প্রার্থী হতে চাও? আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি কুমার।

পরিহাস কোর না জীবা, আমি সামান্য ভ্রাম্যমান মাত্র। এ আমার নিছক কৌতূহলেরই প্রকাশ।

তুমি প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ালে কারো অপেক্ষা নিষ্প্রভ হবে না কুমার। সামান্য যে কটি দিন একত্রে থেকেছি তাতেই আমি এ মন্তব্য করতে সাহসী হয়েছি।

দোহাই তোমার জীবা, বান্ধবীর কাছে এ প্রসঙ্গটি তুলে আমাকে আর সংকোচের মাঝে ফেল না।

কিন্তু কুমার আগেই তো বলেছি, তাঁর কাছে আমার কোন গোপন কথাই গোপন থাকবে না।

তবে গোদান পর্যন্ত তোমার সঙ্গী থাকব আমি, তারপর দুজনের পথ ভিন্ন হয়ে যাবে।

আমার ওপর ক্ষুব্ধ হলে কুমার? অসময়ে তুমি যেভাবে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছ, কোন কিছুর বিনিময়ে আমি তোমার সে বন্ধুত্ব হারাতে চাই না।

কুমারায়ণ সহাস্যে বলল, তোমার ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করা আমার পক্ষে কোন দিনই সম্ভব হবে না জীবা। আমার সামর্থের মধ্যে হলে যে কোন সাহায্যের হাতই আমি তোমার দিকে বাড়িয়ে দেব।

জীবা পূর্বপ্রসঙ্গ টেনে এনে বলল, তুমি জানতে চেয়েছিলে আমার বান্ধবীর জন্য কোন নির্বাচিত প্রার্থী আছে কিনা। না, তাঁর নিজের কিম্বা রাজপরিবারের নির্বাচিত কোন প্রার্থী নেই। তবে চীন সম্রাট তাঁর পুত্রের জন্য রাজভগিনীর পাণি প্রার্থনা করে দূত পাঠিয়েছিলেন। তাছাড়া অগ্নিদেশের তরুণ রাজাও অন্যতম প্রার্থী।

কুমারায়ণ সোচ্ছ্বাসে বলল, খুবই আনন্দ সংবাদ।

না কুমার, কুচীর রাজভগিনীর প্রকৃতি একটু ভিন্ন। শক্তিমান সম্রাটের চেয়ে গুণবান বিদ্বানেরই সে পূজারী।

কুচী কিম্বা পার্শ্ববর্তী অন্য কোন রাজ্যে রাজভগিনীর মনোমত প্রার্থী পাওয়া কি সম্ভব নয়?

সে অন্বেষণ মহারাজ রজতপুষ্প করেছেন, কিন্তু ভগিনীর উপযুক্ত সন্ধান পাননি।

কুমারায়ণ কৌতুক করার জন্য বলল, তোমার বান্ধবীর নাসিকার উচ্চতা সাধারণের অপেক্ষা কিছু বেশি।

জীবা কথার অর্থভেদ করতে না পেয়ে বলল, আমাকে এ কথার অর্থটুকু

বুঝিয়ে বল। আমি তোমার কথার সূক্ষ্ম তাৎপর্য ধরতে পারছি না।

সোজা কথায়, সামান্য কোন বস্তুর ওপরে তার আকর্ষণ নেই, বরং অবজ্ঞার ভাবই আছে।

আমার বান্ধবী সম্বন্ধে দয়া করে এ ধরনের মনোভাব পোষণ না করলেই আমি খুশী হব।

এ আমার সামান্য কৌতুক জীবা। এতে কোনরকম গুরুত্ব দেবে না আশা করি।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। শীতের শিহরণ সারা প্রকৃতিতে। দিবাভাগে উত্তাপ বৃদ্ধি পায়। কখনো কখনো বায়ুপ্রবাহে উত্তপ্ত বালুকা উড়ে চলে। তখন দেহের অনাবৃত অংশ জ্বলতে থাকে। কিন্তু রাতে সম্পূর্ণ অন্য অনুভূতি। বালুকা শীতল, বায়ুর প্রবাহে শীতলতা।

একই পটাবাসের দুই প্রান্তে দুটি শয্যায় দুটি নারী পুরুষে নিদ্রা যায়। সারাদিনের পথশ্রমে ক্লান্ত। তবু তন্দ্রার কোলে সম্পূর্ণ ঢলে পড়ার আগে তারা পরস্পর নানা প্রসঙ্গে আলাপ করতে থাকে! একসময় কথা থেমে যায়। ক্লান্তিহর নিদ্রায় বুজে আসে দু'চোখের পাতা।

কুমারায়ণ বড়ই সজাগ। সামান্য বায়ুপ্রবাহও তার বন্ধ চোখের পাতাকে খুলে দিয়ে যায়। আবাল্য একটি অভ্যাস ও অনুশীলন করে এসেছে, যা সত্যিই বিস্ময়কর। নিদ্রা তার অধিকারে। অতি অল্পকাল সে গভীর তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, পরক্ষণেই ঘটে তার পূর্ণ জাগরণ। এমনি পর্যায়ক্রমে তন্দ্রা আর জাগরণের মধ্যে তার নিশি অতিবাহিত হয়।

রাত্রি দ্বিতীয় যামে শীতল বায়ুর স্পর্শে চোখ মেলে তাকাল কুমারায়ণ। রাত্রি কত তা তার পক্ষে অনুমান করা সম্ভব হল না। সে পাশে রাখা বস্ত্র-নির্মিত স্থলী (থলি) থেকে বাঁশিটা বের করে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। শীতল নিস্তব্ধ প্রকৃতি। আকাশ নির্মল নক্ষত্রখচিত।

পূর্বদিকে দৃষ্টি পড়ল কুমারায়ণের। এক অপার্থিব আলোর খেলা চলেছে পর্বতের চূড়ায়। সাদা ও নীলের মিশ্রণজাত রঙের ফোয়ারা যেন উৎসারিত হয়েছে।

একটি ক্ষুদ্র শাখানদীর কূলে গত সন্ধ্যায় তাদের পটাবাসটি টাঙানো হয়েছিল। সেই নদীর তীরে এসে একটি প্রশস্ত শিলাখণ্ডের ওপর বসল কুমারায়ণ। দৃষ্টি রইল তার পূর্বদিকের পর্বতশিখরে। জীবা বলেছিল ঐ পর্বতমালা কিউনলুন।

আলোর উৎসে স্নান সমাপ্ত করে সদ্য যেন কেউ উঠে এলো। শিখরের আড়ালে হঠাৎ যেন সে থমকে দাঁড়িয়েছে। পরক্ষণেই উজ্জ্বল সুন্দর একটি মুখ উঁকি দিল।

চাঁদ পাহাড়ের আড়াল থেকে উঠে আসছে ওপরে। যেন সে নিশীথ স্নান শেষ করে আলোর সূক্ষ্ম বস্ত্রে দেহ আবৃত করে অভিসারে বেরিয়েছে।

কুমারায়ণের বাঁশি বেজে উঠল। সুরের মোহিনীমায়ায় আবিষ্ট হল চরাচর। সে যেন কোন আলোকতনু কন্যাকে বাঁশির সুরে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে, আর সেই কন্যা আসছে বহু যুগের, বহু জন্ম-জন্মান্তরের ওপার থেকে।

ততক্ষণে পটাবাসের অভ্যন্তরে জীবার কানেও গিয়ে পৌঁছেছে সে বাঁশির সুর। সে আশ্চর্য হয়ে উঠে বসল শয্যায়। পটাবাসের ভেতর তখন এসে পড়েছে চাঁদের এক টুকরো আলো। জীবা দেখল কুমারায়ণ তার শয্যায় নেই, নিঃশব্দে কখন উঠে গেছে।

জীবার বিস্ময় বাড়ল। তাহলে কি কুমারায়ণই সুর সাধছে বাঁশিতে! এত দক্ষ সঙ্গীতসাধক সে! কুচীরাজ্য সঙ্গীত-কলার চর্চায় বহুখ্যাত। শূলিদেশের রাজা একবার একটি সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। সেখানে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন কুচী, সুগ্দ, কম্বুজ, অগ্নিদেশ, চীন প্রভৃতি দেশের বহু গুণী সুরসাধকেরা। সঙ্গীতের অনুষ্ঠান চলেছিল সপ্তদিবস ব্যাপী। যন্ত্র ও কণ্ঠসঙ্গীতের এক মহাসম্মেলন।

সম্মেলন শেষে পণ্ডিতদের বিচারে কুচীর শিল্পীরাই পেয়েছিল শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা।

কুচীর গৃহে গৃহে প্রতিদিন চলে সঙ্গীতের অনুশীলন। বর্ষাকালে যখন বৃষ্টিপাত শুরু হয় তখন শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা চলে যান সন্নিহিত পর্বতের পাশে। নানা ধরনের জলপ্রপাত থেকে জল গড়িয়ে পড়ে বিচিত্র সুরধ্বনির সৃষ্টি করে। সঙ্গীতজ্ঞেরা সেইসব শব্দকে নিপুণভাবে সঙ্গীতে রূপান্তরিত করেন।

নৃত্য ও গীতে নিজেই পটিয়সী জীবা। কিন্তু আজ রাতে বাঁশির সুর তাকে সত্যিই বিচলিত করল। এমন সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করতে সে তার বিংশতি বর্ষের জীবনে কাউকেই দেখেনি।

পটাবাস ছেড়ে শুভ্র পশমের একটি উত্তরীয়ে অঙ্গ আবৃত করে সে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল নদীর ধারে।

তখন ঐ চাঁদের দিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে বাঁশি বাজাচ্ছিল কুমারায়ণ। জীবা ধীরে ধীরে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল, নতজানু হয়ে বসল, তবু ধ্যান ভাঙল না সুরসাধকের। সে বাঁশিতে এতক্ষণ যাকে আকুল হয়ে ডাকছে সে কি এলো তার সুরের পথ ধরে।

বাঁশি একসময় সমে এসে থামল।

তুমি! সত্যি আমি লজ্জিত জীবা, মাঝরাতে তোমার ঘুম ভাঙালাম। পথশ্রমে তুমি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলে।

আমার সমস্ত শ্রান্তি তুমি ঐ বাঁশি শুনিয়ে হরণ করে নিয়েছ কুমার। আমি জানতাম না এতবড় একজন শিল্পী তোমার ভেতর লুকিয়ে আছে।

তুমি যে সঙ্গীতের এতবড় বোদ্ধা তাও আমার জানা ছিল না জীবা।

আমার দেশ কুচীতে সঙ্গীতের বড় সমাদর। সেখানকার শিল্পীরা তোমাকে কাছে পেলে নিদ্রা ভুলে যাবে। শুধু তোমার বাঁশি শুনবে।

তোমার যে ভাল লেগেছে এতেই আমি খুশী জীবা।

আচ্ছা কুমার তুমি এমন অপূর্ব সঙ্গীত কোথা থেকে শিখলে?

আমি তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম জীবা। সেখানে সকল শাস্ত্র শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে।

জীবা সোচ্ছ্বাসে বলল, তক্ষশীলার নাম কুচী দেশের অধিবাসীর কাছে অপরিচিত নয়।

কুমারায়ণ বলল, ভেষজ বিজ্ঞান, চিকিৎসা শাস্ত্র, রাজনীতি, সাহিত্য, দর্শন, কলাবিজ্ঞান, গান্ধর্ববিদ্যা, ধনুর্বেদ প্রভৃতি শেখাবার ব্যবস্থা আছে ঐ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে। এককালে অস্ত্রবিদ্যা বিশারদ আত্রেয় তক্ষশীলার অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর শিষ্য ছিলেন ভেষজবিদ্ জীবক।

নিজের বিদ্যাপীঠের কথা বলতে গিয়ে কুমারায়ণ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

শোন জীবা ভেষজবিদ্ জীবকের শিক্ষাকালের একটি ঘটনা। গুরু আত্রেয় শিষ্যদের বিদ্যা পরীক্ষার জন্য বললেন, ঐ যে সামনে পাহাড় দেখছ, ওখানে গিয়ে তোমরা গাছগাছড়া পরীক্ষা কর। যেগুলি ঔষধ তৈরীর ব্যাপারে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হবে কেবলমাত্র সেইগুলিই আমার কাছে আনবে। প্রয়োজনীয় গাছ একটিও তুলবে না।

সারাদিন অপ্রয়োজনীয় গাছগুলি সংগ্রহ করে ফিরে এলো শিষ্যেরা গুরুর কাছে। আত্রেয় দেখলেন কেবলমাত্র জীবকই শূন্য হাতে ফিরে এসেছে।

আত্রেয় বললেন, কি ব্যাপার জীবক, পর্বতসংলগ্ন এতবড় অরণ্যে তুমি কি একটিও অপ্রয়োজনীয় বৃক্ষ, লতা, গুল্ম পেলে না?

জীবক উত্তর দিল, না গুরুদেব। প্রতিটি বৃক্ষ পরীক্ষা করার পর আমার মনে হয়েছে, সবগুলিই ভেষজ গুণসম্পন্ন।

জীবা বলল, আশ্চর্য গুরুর ক্ষণজন্মা শিষ্য এই জীবক। তুমি তক্ষশীলায় কি কি বিষয়ে শিক্ষালাভ করেছ কুমার? এ আমার নিছক কৌতূহল জানবে।

বিশেষভাবে ললিতকলা, গান্ধর্ববিদ্যা ও ধনুর্বেদ।

আশ্চর্য! কেবল বাঁশি নয়, শর-সন্ধানেও তোমার নৈপুণ্য আছে! কুমারায়ণ বলল, ধনুর্বিদ্যায় ও ললিতকলায় পারদর্শিতার জন্য আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পুরস্কারও লাভ করেছি।

উৎসুক হয়ে উঠল জীবা, কি সে পুরস্কার কুমার?

একটি মূল্যবান অসি, একটি উষ্ণীষ আর তীরপূর্ণ তূণীরসহ ধনু।

সেই পুরস্কারগুলি এখনও কি তোমার গৃহে আছে?

সেগুলি আমার সঙ্গেই থাকে জীবা। পটাবাসের মধ্যে আমার যে চর্ম পেটি-

কাটি আছে তারই ভেতর সেগুলি সযত্নে রেখে দিয়েছি।

জীবা বলল, তুমি শুধু শাস্ত্রবিদ নও সুনিপুণ শস্ত্রবিদও বটে। কিন্তু সবার ওপরে তোমার সঙ্গীত প্রতিভা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

নীরবে কিছুক্ষণ বসে রইল কুমারায়ণ। একটা সুখ-দুঃখময় স্মৃতির অতলে সে সেই মুহূর্তে তলিয়ে গেল।

তার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে জীবা এক সময় প্রশ্ন করল, কি ভাবছ কুমার? ফেলে আসা সংসারের কথা?

আমি সংসারী নই জীবা। পিতামাতা গত হয়েছেন কৈশোরে। আমার পিতা ছিলেন এক ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ও পুরোহিত। তাঁর মৃত্যুর পরে আমি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের ষড়যন্ত্রে রাজার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হই। সেই বঞ্চনাই আমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি যোগায়। আমি ষোড়শ বর্ষে তক্ষশীলায় যাই। সেখানে পঞ্চবর্ষকাল বিদ্যা শিক্ষা করে যখন বেরিয়ে আসি তখন এ জগতে আমি নিঃসঙ্গ। পথই তখন থেকে আমার গৃহ। তক্ষশীলা থেকে পাটলীপুত্র পর্যন্ত যে রাজপথটি চলে গেছে আমি সেই পথ ধরে এগোতে থাকি। উদ্দেশ্য, রাজগৃহের সন্নিকটে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহশালাটি দেখা।

এই পথযাত্রার প্রায় প্রারম্ভেই সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ। আর এই পরিচয়ের সূত্র ধরেই আমার জীবনে নেমে এল এক ঘূর্ণাবর্ত।

হঠাৎ কথার মাঝে থেমে গেল কুমারায়ণ।

জীবা সাগ্রহে বলল, থামলে কেন কুমার? তোমার জীবনের প্রতিটি কথা শোনার জন্য আমি উৎকর্ণ হয়ে আছি জানবে।

সে এক বেদনাময় ইতিবৃত্ত জীবা। বলতে পার সেই যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্যই আমি ভারতভূমি ত্যাগ করে এতদূরে এসে পড়েছি।

আবার থামল কুমারায়ণ। দূরের-পর্বতমালার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে রইল।

থামলে কেন কুমার? যদি কোন দুঃখবেদনা থাকে তোমার জীবনে তাহলে সে বেদনার অংশ তোমার দু'দিনের সঙ্গীকেও ভাগ করে দাও।

হাসল কুমারায়ণ। বিচিত্র জীবন, বিচিত্র তার লীলা-কাহিনী। হ্যাঁ, আমাদের দুজনের সঙ্গে সেদিনের যাত্রারও কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যাবে।

সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারটিও আমার বেশ অভিনব।

দুই

চলেছি তক্ষশীলা থেকে পাটলিপুত্রের রাজপথ ধরে। পথে পড়ল এমনি এক ক্ষুদ্র নদী। ক্ষুদ্র হলেও বড় সংক্ষুব্ধ সে নদী। তীরে নিবিড় বন। সারাদিন

পথ চলায় ক্লান্ত ছিলাম, প্রায় অভুক্ত, বিশ্রামের প্রয়োজন। এই সুদীর্ঘ পথের ধারে ধারে পানীয় জলের কূপ ও বিশ্রাম গৃহ ছিল, কিন্তু তরুণ প্রাণের উন্মাদনাই আলাদা। যতদূর পারি পথ অতিক্রম করে যাব। নদীনালা ডিঙিয়েও বক্র পথকে সোজা করে নেব। সেই প্রেরণাতেই পথ ছেড়ে নেমে এসেছিলাম নদীর ধারে। সন্ধ্যায় নদী পার হবার চেষ্টা পরিত্যাগ করতে হল। এখন কোথায় রাতের আস্তানা পাতা যায়!

একটি বৃহৎ বটবৃক্ষ দেখে তারই ওপর আরোহণ করলাম। ওরই একটি ডালের এক সুবিধাজনক কোণে রাতের মত আশ্রয় রচনা করে নিলাম।

সন্ধ্যা নামল। কিন্তু অন্ধকার ঘনিয়ে ওঠার সুযোগ পেল না। কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদের চাঁদ প্রায় পূর্ণ একখানা থালার মত বনভূমির বৃক্ষশীর্ষে জেগে উঠল। ক্রমে ক্রমে উজ্জ্বলতর হতে লাগল জ্যোৎস্না। নীচে স্রোতস্বিনীর তরঙ্গে তখন রূপোর কুচি ছড়াচ্ছে চাঁদের আলো।

দেহের ক্লান্তি এই রমণীয় অরণ্য-সন্ধ্যায় আমাকে পরাভূত করতে পারল না। ঠিক আজ রাতের মত আমি সেদিনও বাঁশিটি বের করে চাঁদের দিকে তাকিয়ে ফুঁ দিতে গেলাম। কিন্তু ফুঁ দেওয়া আর হল না।

চাঁদের আলোয় তখন চরাচর ভেসে যাচ্ছিল। বৃক্ষরাজির আড়াল থেকে দেখলাম, অরণ্য সংলগ্ন প্রান্তরে শত শত শিবির পড়েছে। কোলাহল নেই, আলোও প্রজ্জ্বলিত হয়নি।

স্বাভাবিক ধারণাবশে ভেবে নিলাম এ কোন সংগুপ্ত সৈন্য নিবাস।

একদিকে সবুজপত্রে সমাচ্ছন্ন কতকগুলি বৃক্ষের অন্তরালে পাশাপাশি দুটি পটাবাস। বর্ণে সজ্জায় অতি সুশোভিত। একটি ক্ষুদ্র, অন্যটি বৃহৎ। বৃহদাকার পটাবাসটি রক্তবর্ণের বস্ত্রখণ্ডে প্রস্তুত। হরিদ্রাবর্ণের কেতন উড়ছে শীর্ষে। ক্ষুদ্রটি নব কদলীপত্রের আভাযুক্ত বস্ত্রখণ্ডে নির্মিত। এটির শীর্ষে কোন ধ্বজা ছিল না। দুটি পটাবাসই আমার আশ্রয়-বৃক্ষের সন্নিকটে। কিন্তু ঘন পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষের অন্তরালে থাকায় পটাবাস দুটি সম্পূর্ণ দৃষ্টিগোচর ছিল না।

হঠাৎ শিবিরের দিক থেকে একটি অতি সুশোভিত হাতলযুক্ত সিংহাসন চারজন বাহক বয়ে নিয়ে এলো বৃহদাকার পটাবাসটির সামনে। এক কান্তিমান পুরুষ, তাঁকে পুরুষ-সিংহই বলা চলে, ধীর পায়ে বেরিয়ে এসে বসলেন সেই সিংহাসনে। বাহকেরা সেই সিংহাসনটি অরণ্যের মধ্যে দিয়ে বয়ে এনে বসিয়ে দিলে নদীতীরে। আমি এখন স্পষ্ট তাদের দেখতে পাচ্ছিলাম। বাহকেরা সিংহাসনটি বসিয়ে রেখেই চলে গেল। ধীরে ধীরে অরণ্যের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো এক যুবতী নারী। ঠিক যেন শ্রেষ্ঠ ভাস্করের হাতে গড়া কোন প্রতিমা। যুবতীর হাতে তালপত্রের সুদৃশ্য একটি ব্যজনী। সে সলজ্জ অথচ সুস্থির পদক্ষেপে এসে দাঁড়ালো সেই পুরুষ-প্রধানের পশ্চাতে। অলঙ্কার

শোভিত দক্ষিণ বাহুটি উত্তোলন করে অপরূপ আন্দোলনে ব্যজন করতে লাগল।

আমার আশ্রয়স্থল থেকে নাতিদূরেই ঘটনাটি ঘটছিল।

আমি এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, সেই পুরুষ তাঁর অঙ্কে কোনো একটি বস্তু বহন করে এনেছিলেন। সেই বস্তুটি উত্তোলন করতেই বুঝলাম, সেটি একটি বীণা।

তারপর শুরু হল বাদন। সেই শেফালিকা পুষ্পের মত শুভ্র জ্যোৎস্না, কলধ্বনিমুখর স্রোতপ্রবাহ, অরণ্যের পত্রকরতাল যুক্ত হল সেই বীণার ধ্বনির সঙ্গে।

আমি তন্ময় হয়ে শুনতে লাগলাম সেই অপার্থিব বীণার সুর।

শুনতে শুনতে গভীর অনুপ্রেরণার বশে কখন যে ওষ্ঠে তুলে নিলাম বাঁশিটি, তা নিজেই বুঝে উঠতে পারিনি।

ঐ বীণার ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে আমার বাঁশিও সুর মেলালো। আমি বৃক্ষের ওপরে বসে বাঁশি বাজাচ্ছিলাম, তাই আমার বাঁশির সুর বাতাসে ভর করে ছড়িয়ে পড়ছিল চতুর্দিকে।

সহসা বীণা থেমে গেল কিন্তু আমার বাঁশি থামল না। পূর্ণ শিক্ষা প্রয়োগ করে আমি যখন সম্পূর্ণ রাগটিকে রূপায়িত করে থামলাম তখন চেয়ে দেখি সেই সম্ভ্রান্ত বীণকার উঠে দাঁড়িয়েছেন। বংশীবাদককে দেখতে না পেয়ে চারদিকে তিনি মস্তক আন্দোলন করতে লাগলেন। আমি তখন নিশ্চুপ হয়ে বৃক্ষপত্রের অন্তরালে বসে আছি। দেখলাম, সেই সেবিকা কন্যাটিও বিহ্বল দৃষ্টিতে বনের দিকে চেয়ে আছে। তার করধৃত ব্যজনীটি থেমে গেছে।

পুরুষ তখন উচ্চকণ্ঠে বললেন, যদি তুমি কোন গন্ধর্ব, সিদ্ধ অথবা দেবদূত হও তাহলে নেমে এস আমার সামনে। আমি তোমাকে বন্দনা করি।

বৃক্ষের ওপর থেকে আমিও বললাম, যেমন দীপ থেকে দীপ প্রজ্বলিত হয়, হে মহাত্মন্, আমি আপনার বীণার রাগিণী থেকেই আমার সুরের দীপটিকে জ্বালিয়ে নিয়েছি।

তুমি যেই হও আমার সামনে এসে দাঁড়াও। সবকিছু আমার কাছে জ্যোৎস্না ধৌত অরণ্যের মত অলৌকিক বলে মনে হচ্ছে।

আমি সেই পুরুষপ্রবরের কাব্যগুণসমৃদ্ধ বাক্য শুনে অনুপ্রাণিত হচ্ছিলাম। দূর থেকে তাঁর অবয়ব আমার চোখে মহিমময় সম্রাটের মত মনে হচ্ছিল।

আমি চর্ম পেটিকা থেকে ধনু আর শর বের করে নিলাম। শরটি ধনুতে সংযোজন করে সবেগে নিক্ষেপ করলাম। তীরটি আমার অভিপ্রায় অনুযায়ী ঐ পুরুষোত্তমের পদতলের সম্মুখভাগে প্রোথিত হয়ে গেল।

তিনি প্রথমে বিচলিত হলেন, পরে উচ্চকণ্ঠে বাহবা দিয়ে উঠলেন।

আমি গাছ থেকে নেমে সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

কে তুমি?

আমি ভ্রাম্যমান এক যুবক। কুমারায়ণ আমার নাম।

নিবাস ?

গান্ধার দেশে জন্ম। বর্তমানে পথই আমার বাসস্থান মহাত্মন।

তোমার আকৃতি দেখলে উচ্চ কুলোদ্ভব বলে মনে হয়।

আমি কোনো উত্তর না দিয়ে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

আমাকে বাক্যহীন দেখে এবার সেই পুরুষপ্রবর বললেন, আমি বিস্মিত হয়েছি তোমার সঙ্গীত প্রতিভায়, তার চেয়ে কম বিস্মিত হইনি তোমার শর নিক্ষেপের নৈপুণ্য দেখে। এসব তুমি কোথায় শিখলে যুবক ?

'তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

আমার উত্তর শোনামাত্র সসম্ভ্রমে উক্তি বেরিয়ে এলো তাঁর কণ্ঠ দিয়ে, ভুবন-বিদিত শিক্ষাকেন্দ্র। বৈয়াকরণ পাণিনী, পতঞ্জলি, রাজনীতি বিশারদ চাণক্য, শরীর বিজ্ঞানী আত্রেয়, জীবক, সর্বজ্ঞ অশ্বঘোষ—এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই রত্নস্বরূপ ছিলেন। তুমি সেই ঐতিহ্যময় বিশ্ববিদ্যালয়েরই সার্থক শিক্ষার্থী।

ক্ষণকাল থেমে তিনি আবার বললেন, কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে পথে বেরিয়েছ কি ?

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়টি দেখার ইচ্ছা আমার বহুদিনের। শুনেছি গ্রন্থাগারটি বহু মূল্যবান গ্রন্থে সমৃদ্ধ।

তোমার ইচ্ছা অপূর্ণ থাকবে না যুবক। সত্যিই শুনেছ তুমি গ্রন্থাগারটির উচ্চ মানের কথা। তিনটি সুবিশাল গৃহে বহু সহস্র পুঁথি রক্ষিত আছে। একটি অট্টালিকার নাম রত্নোদধি। অন্যদুটি রত্নসাগর ও রত্নরঞ্জক। শুধু রত্নোদধিই নবতল বিশিষ্ট একখানি উচ্চগৃহ। তাহলে অনুমান কর পুঁথি সংগ্রহশালাটি কত বৃহৎ।

বললাম, আমার অপরাধ নেবেন না মহাত্মন, আপনি কি ঐ অঞ্চল নিবাসী ?

যুবতীর কণ্ঠ থেকে সহসা একটি বিস্ময়সূচক ধ্বনি নির্গত হয়েই থেমে গেল।

পুরুষপ্রবর বললেন, তোমার অনুমান সত্য। এখন শোন যুবক, আমি বর্তমানে অশ্বমেধের অশ্ব নিয়ে ভারত ভ্রমণ করছি। সম্প্রতি মালব থেকে এসেছি পঞ্চনদের দেশে। যুদ্ধ আমার অভিপ্রেত নয়। মগধের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করে বন্ধুভাবাপন্ন হলেই আমি তাকে মিত্ররাষ্ট্র হিসেবে স্বীকার করে নিচ্ছি।

যতদূর সম্ভব নত হয়ে অভিবাদন জানিয়ে বললাম, আমি কি সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সঙ্গে বাক্যালাপের সৌভাগ্য এতক্ষণ লাভ করেছি ?

আমি ভারতবর্ষের সর্বত্র ঐ নামেই পরিচিত যুবক।

বললাম, শুনেছিলাম আপনি বীর, কিন্তু এখন দেখছি শ্রেষ্ঠ এক সঙ্গীত বিশারদ।

সম্রাট আমার হাত ধরলেন, তোমার আপত্তি না থাকলে তুমি আমার সঙ্গী হয়ে থাকবে যুবক। আমি শীঘ্র রাজ্য অভিমুখে ফিরে যাব। তখন সহজেই তুমি নালন্দা দর্শন করতে পারবে।

আমি কয়েক দিনের মধ্যেই সম্রাটের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র হয়ে উঠলাম। তিনি স্কন্ধাবারে আমাকে না রেখে তাঁর নিজের শিবিরের একান্তে আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন।

প্রতিদিন সম্রাট আমার শরক্ষেপণ আর অসি চালনার কৌশল লক্ষ্য করতেন। তিনি স্বয়ং ছিলেন শক্তিমান যোদ্ধা। আমার সঙ্গে অসিযুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন। কোনদিন আমি জয়ী, কোনদিন বা সম্রাট বিজয়ী হতেন। কিন্তু তীরের নিশানায় কেবল সম্রাটই নন, তাঁর বিপুল সৈন্যবাহিনীর একজনও আমার সমকক্ষ ছিল না।

রাতে একান্তে সম্রাটের শিবিরে আমরা মুখোমুখি বসতাম। তিনি আমাকে সীমান্ত নগরী গান্ধার, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক ও কুষাণদের রাজ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করতেন। আমি আমার জ্ঞানবুদ্ধি মত তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়ে যেতাম।

কোন কোনদিন কাব্যালোচনা হত। কোথা দিয়ে যে মধ্যরাত্রি পার হয়ে যেত তা আমরা বুঝতে পারতাম না।

সম্রাট যৌধেয় থেকে মদ্রকে তাঁর অভিযান পরিচালনার বাসনা প্রকাশ করলেন। গুপ্তচরেরা খবর নিয়ে এল, মদ্রকের রাজা পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করে সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের বিরুদ্ধে শক্তিশালী এক প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করছে।

সম্রাট কালবিলম্ব না করে স্কন্ধাবার থেকে কালজ্ঞ জ্যোতির্বেত্তাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি সম্রাটের সামনে গণনা করে যুদ্ধযাত্রার সঠিক কাল নির্ণয় করে দিলেন।

জ্যোতির্বেত্তা বললেন, সম্রাট, গণনার ব্যাপারে আপনার সঙ্গে একান্তে আরও কিছু কথা বলার আছে।

সম্রাট সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ইঙ্গিত করতেই আমি পটাবাসের বাইরে চলে এলাম। কিন্তু আমার মনে হল কালজ্ঞ আমার সম্বন্ধেই সম্রাটের কাছে কিছু বলতে চান। কারণ কিছুকাল থেকে লক্ষ্য করছিলাম, সেনাপতি আমার প্রতি বিমুখ। হয়তো অল্পকালের মধ্যে রাজার এতখানি প্রিয়পাত্র হবার জন্য তিনি ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়েছেন। আর জ্যোতির্বেত্তা মহাশয় যে সেনাপতির একান্ত ঘনিষ্ঠ জন তা আমি নানা অনুষ্ঠানে লক্ষ্য করেছিলাম।

শেষে আমার অনুমানই সত্য হল। জ্যোতির্বেত্তার কথাগুলি আমার কানে ভেসে এল, সম্রাট, এই অভিযানে কোন বিদেশী আপনার সঙ্গে থাকলে জয় সম্বন্ধে

অনিশ্চয়তা দেখা দিতে পারে। তাছাড়া প্রাসাদের অভ্যন্তরে নারী রত্ন হবে অভিযানের পথে অবশ্যই পরিত্যজ্য। আপনি দূরদর্শী, বিচক্ষণ পুরুষ, সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অধিকার আপনার।

এই কটি কথা বলে জ্যোতির্বেত্তা স্কন্ধাবারে ফিরে গেলেন।

সম্রাট আমার প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ ছিলেন। তবুও তিনি জ্যোতির্বেত্তা কথা ফেলতে পারলেন না। প্রভাতে আমাকে তাঁর কাছে ডেকে বললেন, কুমা তোমার ওপরে আমি একটি ভার অর্পণ করতে চাই।

সবিনয়ে বললাম, বলুন সম্রাট, সে তো আমার সৌভাগ্য।

আমি না বুঝেই কথাটা বললাম।

সম্রাট বললেন, তোমাকে যোগ্য বিবেচনা করেই এ ভার দিতে চাইছি। এখ শোন, অর্জুনায়ণের অভিযান থেকে যেসব উপঢৌকন আমি পেয়েছিলাম ত মধ্যে সবচেয়ে সেরা উপহার রাজকন্যা বেতসা। তুমি তাকে দেখেছ। (আমার উপস্থাপিকার কাজে নিযুক্ত। বুদ্ধিতে দীপ্ত, স্বভাবে মিষ্টতা, কর্ত নিষ্ঠা বেতসার সহজাত।

একটু থেমে সম্রাট বললেন, আমি মদ্রকে আমার বাহিনী নিয়ে যাচ্ছি, কিন্ত আমি চাইনা বেতসা আমার সঙ্গী হোক। তাই তাকে আমি রাজধানী পাটলি পুত্রে পাঠাতে চাই। তুমি সম্ভ্রান্ত, বিশ্বস্ত ও শক্তিমান। আমি তোমা বেতসার সঙ্গে তার নিরাপত্তার ভার দিয়ে পাঠাতে মনস্থ করেছি। এখন তোমা অভিমতের ওপর সবকিছু নির্ভর করছে।

বললাম, আপনার ইচ্ছাই আমার কাছে আদেশ সম্রাট।

সঙ্গে সঙ্গে রাজচক্রবর্তী বললেন, অবশ্য থলনিয়ামক (পথপ্রদর্শক) থাকব তোমার সঙ্গে। একখানি অশ্ববাহিত রথ আর উপযুক্ত রক্ষীও থাকবে তোমা অধীনে।

সবিনয়ে বললাম, সবকিছুই থাকবে, কেবল রক্ষীদের সঙ্গে না দিলে ভা হয়। আমার ওপর যদি সম্রাটের ভরসা থাকে, তাহলে অন্য কোন রক্ষী প্রয়োজন আশা করি হবে না।

সম্রাট হেসে বললেন, তথাস্তু।

বেতসার সঙ্গে শুরু হল পথচলা। রথের চালকই ছিল আমাদের থল (স্থল নিয়ামক। আমি একটি অশ্বে আরোহণ করে বেতসার রথের সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলাম। আমাদের ইচ্ছা হলে রাতেও চলতাম। এ সময় রথচালক আকাশে নক্ষত্র দেখে দিগ্ নির্ণয় করত। তার হিসেব থেকে জানতে পারি আমাদে প্রায় নব্বুই যোজন পথ অতিক্রম করতে হবে। সে রথ চালিয়ে নিয়ে যাবে মথুর কৌশাম্বী, শ্রাবস্তী, বৈশালী হয়ে পাটলিপুত্রে।

এ পথটি অতি সুরক্ষিত। এই পথে সার্থবাহ ও সাধারণ বণিকেরা দলে দলে যাতায়াত করে। সার্থবাহরা বলীবর্দ বাহিত দ্বিচক্রযানে পণ্যসম্ভার নিয়ে

চলাচল করে। একসঙ্গে প্রায় পাঁচশত গো-শকটকে আমরা দলবদ্ধ ভাবে যেতে দেখলাম। তাদের কাছে তীরধনু ও অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্র ছিল। দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হলে যাতে প্রতিরোধ করতে পারে তাই এ ব্যবস্থা। পথের স্থানে স্থানে দূরত্ব জ্ঞাপক প্রস্তর ফলক প্রোথিত দেখেছিলাম।

আমাদের রথের কেতনের প্রতীক ছিল অশ্ব। অশ্বমেধ যজ্ঞ করে একরাট হবেন সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত, তাই তাঁর ধ্বজায় অশ্ব-লাঞ্ছন।

সার্থবাহের দলটি আসছিল তাম্রলিপ্ত থেকে। তারা সম্রাটের ধ্বজাচিহ্ন রথের ওপর উড্ডীন দেখে শকট থামিয়ে নেমে এল। উপযুক্ত অভিবাদন জানাল আমাদের। তারা বেতসাকে সম্মানিত করল নারিকেল, গুবাক, সূক্ষ্ম বস্ত্র ও শঙ্খমালা দিয়ে।

প্রশ্ন করে জানতে পারলাম, এরা যাচ্ছে সিন্ধু-সৌবীর দেশে (সিন্ধু ও বিতস্তা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল)। ওখানকার বণিক সঙ্ঘের হাতে পৌঁছে দেবে পূর্বাঞ্চলের সদাগরী-সম্ভার। তারা সে সকল নিয়ে যাবে বহির্ভারতে।

ঘন ঘন মনুষ্য চলাচল ও শকটাদির গমনাগমনের জন্য পথিপার্শ্বস্থ অরণ্য থেকে কোন হিংস্র জন্তু পথের ওপর মানুষকে আক্রমণ করতে নেমে আসত না। আমরা প্রায় নির্ভয়ে শুক্লপক্ষের রাতে দ্বিতীয় যাম পর্যন্ত পথ চলতাম।

প্রৌঢ় রথচালক গব্বারাম আমাদের খুব প্রিয় ছিল। লোকটির ছেলে বউ দুজনেই মারা গিয়েছিল। ছেলেটি বেঁচে থাকলে নাকি আমার বয়সী হত, তাই আমার ওপর গব্বার গভীর অপত্য স্নেহ জন্মে গিয়েছিল।

ঘোড়া না চালিয়ে আমি যাতে রথে চড়ে বসি সেজন্যে গব্বারাম পীড়াপীড়ি করত। আমি তাকে আশ্বস্ত করে বলতাম, দরকার হলে আমি নিশ্চয়ই রথে উঠব।

বেশ রসিক ছিল গব্বারাম। সে গ্রাম-গেয় গীত গাইত। শাশুড়ী আর বধূর কলহের কথা থাকত তার ভেতর। গান থামিয়ে সে বলত, ভাগ্যিস বউটা মরেছিল নাহলে ছেলের বউ-এর সঙ্গে খুনসুটি লেগে যেত। আর ছেলেটা মরল অকালে তাই পরের ঘরের মেয়েটাকে আর আনতে হল না।

কখনো বলত, রাজার বাড়ির ঘোড়া সামনে হাঁটে পেছনে হটে।

বলতাম, এর অর্থ কি গব্বারাম ?

বলত, রাজা যখন শত্রুকে তাড়া করে নিয়ে যায় তখন ঘোড়া সামনে ছোটে, আর যুদ্ধে যখন হার হয় তখন ঘোড়া পেছনে হটে।

কখনো বলত, বউ আমার মরে বেঁচেছে, আর চোর হোঁচট খেয়ে মরেছে।

কিরকম ?

ঘুমিয়ে পড়লে হঠাৎ, হঠাৎ আমার নাকটা গর্জে উঠত। অমনি বউ জেগে উঠে নাকের ফুটোয় গর্জন তেল ঢেলে দিত। আর যায় কোথা, ব্রহ্মরন্ধ্র ফাটিয়ে হাঁচি পড়ত। তারপর সব চুপচাপ। সে আর কতক্ষণ, আবার গর্জন,

আবার গৃহিনীর নিদ্রাভঙ্গ। বেচারা এমনি করতে করতে বেহাল হয়ে গেল। শেষে মরে বাঁচল।

গব্বারাম থামলে আমি বললাম, চোর মরল কি করে ?

চোর সিঁড়ির মাথায় উঠে এসে দরজা খোলার তাল করছিল। অমনি হাঁকার ছেড়ে নাকের গর্জন। ব্যস, বাঘ ডাকছে ভেবে ছিটকে পড়ল সিঁড়ির তলায়। নীচে ছিল পাথর, মরল মাথা ঠুকে।

গব্বারামের রসকৌতুকের ভেতর দিয়ে আমরা বড় আরামে পথ চলেছিলাম। গব্বার ওপরে খাবার তৈরির ভারও দেওয়া ছিল, কিন্তু বেতসা ওকে কিছুতেই রান্না করতে দিত না। সে নিজের হাতে খাবার তৈরি করে আমাদের খাওয়াত। গব্বা ঘুমুলে হাজার ডাকেও তার সাড়া পাওয়া যেত না। ঠেলাঠেলিতেও তাকে জাগিয়ে তোলা ভার হত। নাকের গর্জনে বাঘেরও কাছেপিঠে ভেড়ার সাহস হত না।

গব্বারাম ঘুমিয়ে পড়লে আমি আর বেতসা গল্প করতাম। অর্জুনায়ণের রাজার মেয়ে সে। শোভন, সুন্দর, মার্জিত ছিল তার ব্যবহার। কিন্তু যেহেতু সে যুবতী, প্রথম বিকশিত ফুলের মত জেগে উঠেছে, সে চাইত তার সুবাসটুকু ছড়িয়ে দিতে। তারই ভেতর দিয়ে আমন্ত্রণ জানাত সে মধুকরকে। সে আমন্ত্রণে উগ্রতা ছিল না, ছিল সলজ্জ ভীরুতা।

আমি স্বভাবতই আমার তক্ষশীলার শিক্ষাজীবনের দিনগুলির কথা তাকে বলতাম। আর বলতাম আমার ভ্রাম্যমান জীবনের গল্প। আমি বেশ বুঝতে পারতাম, আমার কাহিনীগুলি তার মনের গভীরে রেখাপাত করছে। ধীরে ধীরে আমি তার ভেতর একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। হঠাৎ আমার গল্প শুনতে শুনতে সে অন্যমনস্ক হয়ে যেত। আমি স্পষ্ট দেখতে পেতাম, তার চোখের আড়ালে জলভরা মেঘ থমথম করছে।

আমি তার ভাবান্তর লক্ষ্য করে আমার পথ বদলালাম। আমি তাকেই বেশী কথা বলতে দিতাম। আমি জানতাম, একজন মনের কথা অনর্গল বলে যেতে পারলে তার মনের ভার অনেকখানি হাল্কা হয়ে যায়।

কিন্তু এ ধারণা পরে আমাকে অস্বস্তির মাঝে ফেলে দিলে। একদিন অনর্গল কথা বলতে বলতে সে তার গোপন মনের কথা প্রকাশ করে ফেলল। ভীরুতা কেটে গেল তার। স্পষ্ট করে না বললেও আমি বুঝলাম, সে সাম্রাজ্য, সম্রাট কিছুই চায় না, পথে পথে যাযাবরের জীবনযাপন করতে পারলে সে সুখী হয়।

আমি বললাম, বেতসা (ঐ নামেই তাকে তখন ডাকতে শুরু করেছি।), তোমার জীবনের ধারা কিন্তু ঠিক খাতেই বইছে।

বেতসার গলায় বিস্ময়ের সুর, কিরকম ?

বললাম, তুমি রাজার কন্যা, প্রাসাদের সম্ভ্রান্ত ও রক্ষণশীল পরিবেশে মানুষ। এদিকে ভারত সম্রাটের অন্তঃপুরে তুমি প্রবেশ করতে চলেছ। অতএব তোমার জীবনের ধারা অবিচ্ছিন্নই রইল।

ও শুধু একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে বলল, সে তুমি বুঝবে না কুমার।

এরপর আমার নীরব থাকার পালা, তবু বললাম, সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত শুধু শক্তিমানই নন হৃদয়বানও বটে। যিনি সঙ্গীতের সাধক তাঁর হৃদয় স্বভাবতই উদার হয়।

বেতসা ঐ প্রসঙ্গে ইতি টেনে দিয়ে বলল, তুমি তোমার বাঁশি বাজিয়ে শোনাবে কুমার ?

আমি বুঝতে পারলাম, সম্রাট সংক্রান্ত কোন প্রসঙ্গ ও আর তুলতে চাইছে না।

আমি বাঁশি বাজালাম। ওর অনুরোধে বারে বারে।

একটি রাগ শেষ হয়ে গেলে ও কিছু মন্তব্য করল, আমি যেন এক জলচর হংসী, নদীর স্রোতে ভাসতে ভাসতে কতদূর চলে গেছি। আবার এক সময় গলায় হতাশার সুর তুলে বলল, আমাদের সোনার পিঞ্জরে একটি শুক পাখি বাঁধা ছিল। তাকে অনেক বুলি শেখান হয়েছিল। ভাল ভাল খাবারও দেওয়া হত। কিন্তু এ ব্যবস্থাটা আমার ভাল লাগল না। আমি একদিন তাকে উড়িয়ে দিলাম। সে সবুজ বনের দিকে উড়ে যাবার জন্য পাখা ঝাপটাল, কিন্তু পারল না, পড়ল গিয়ে প্রান্তরে। আমি বাতায়ন থেকে দেখলাম, একটা হিংস্র মার্জার ছুটে এসে তাকে মুখে তুলে নিয়ে গেল। আমি হাহাকার করে উঠলাম।

থামল বেতসা। আমি বললাম, আমার বাঁশি শুনে তোমার এ ধরনের একটা কথা মনে পড়ল কেন বেতসা ?

ও বলল, জানি না কেন। মনে হল, তাই বললাম।

ও উদাস চোখে তারাভরা রাত্রির দিকে চেয়ে রইল ! আমি সেই ভাববিহ্বল রহস্যময়ী রমণীকে দেখতে লাগলাম।

যাত্রাপথে একদিন একটি ঘটনা ঘটল। কৌশাম্বী পেরিয়ে তখন আমাদের রথ শ্রাবস্তীর রাস্তা ধরেছে। চলেছি আমরা উঁচু-নীচু পথের ওপর দিয়ে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট ঝোপঝাড়। স্থানে স্থানে দু'একটি বনস্পতি শাখাবাহু মেলে দাঁড়িয়ে আছে।

সন্ধ্যার সময় যথারীতি আমরা পথের ধারে রথ থামিয়ে রাত্রিবাসের আয়োজন করলাম। যে জায়গায় আমরা আস্তানা পাতলাম তার ধারে-কাছে কোন লোকজন ছিল না। সামনে একটি উঁচু ঢিবির মত স্থান ঢালু হয়ে নীচের দিকে নেমে গেছে। ঝোপঝাড়ে স্থানটি সমাচ্ছন্ন। মধ্যরাত্রি। পটাবাসের ভেতরে বেতসা নিদ্রামগ্ন। গন্ধারাম দ্বারের কাছে শয্যা গ্রহণ করে প্রবলভাবে নাসিকা গর্জন করে চলেছে। আমি রথের ভেতর আশ্রয় নিয়েছি। তুমি হয়তো জান না জীবা, নিদ্রা আমার করায়ত্ত। মুহূর্তে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যাই, পরমুহূর্তে জাগরণ। এ আমার আকৈশোর অভ্যেস। তারপর কি হল শোন।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতে নারী কণ্ঠের একটা আর্ত চিৎকার কানে এসে বাজল। কোমরবন্ধে সারাক্ষণ একটা কোষবদ্ধ অসি রাখতাম আমি। লাফ দিয়ে রথ থেকে পথের ওপর পড়লাম। তারপর শব্দ লক্ষ্য করে উঠলাম ঢিবির ওপর। ক্ষীণ

চন্দ্রালোকে অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল সবকিছু। ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে নীচে চোখ পড়তেই দেখলাম, পত্রাচ্ছাদিত একটি বিশাল বৃক্ষের তলায় একটি নারীকে লাঞ্ছিত করছে এক ভীষণাকার দস্যু। আমি অসি কোষমুক্ত করে বিদ্যুৎ গতিতে নীচে নেমে গেলাম।

আমাকে দেখেই যেন ঐ দস্যু রণে ভঙ্গ দিল। আমি সেই পলাতকের পশ্চাদ্ধাবন করে কয়েক পদ অগ্রসর হয়েছি হঠাৎ ঢিবির ওপর থেকে বেতসার চিৎকার শুনতে পেলাম। চকিতে পেছনে ফিরে তাকাতে গেলাম, কিন্তু ততক্ষণে একটি ছুরিকা আমার বাম বাহুতে বিদ্ধ হয়েছে। আমি যদি সেই মুহূর্তে বেতসার চিৎকার শুনে ফিরে না দাঁড়াতাম তাহলে নিশ্চিত ঐ ছুরিকা আমার পৃষ্ঠদেশ ভেদ করে আমাকে অব্যর্থ মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিত।

সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ হস্তের অসিতে আততায়ীকে আঘাত করলাম। আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি ঐ ধর্ষিতা নারী স্বয়ং দস্যুদলের নেত্রী। সে পশ্চাৎ থেকে যে আমাকে ছুরিকাঘাত করবে তা ছিল আমার ভাবনার বাইরে।

এখন পলাতক দস্যুটি আমাকে আক্রমণ করার জন্য উদ্যত। শুধু তাই নয়, ঐ বিশাল বৃক্ষটি থেকে ততক্ষণে আরও চার পাঁচটি দস্যু ভূমিতলে অবতীর্ণ হয়েছে। তারাও ঘিরে ফেলেছে আমাকে। ওদিকে বেতসা আমার বিপদ দেখে আর্ত চিৎকার করতে করতে নীচে নেমে আসছে।

আমি আমার অসি চালনার শিক্ষা কাজে লাগালাম। দস্যুগুলি নিহত হল আমার হাতে। ওদের হত্যা করার অভিপ্রায় ছিল না আমার। আমি ওদের অস্ত্র কেড়ে নিতে পারতাম, কিন্তু ওদের মুক্তি দিলে ওরা আবার বহু পথচারীকে হত্যা করবে, তাই তাদের চরম দণ্ড দানই যুক্তিযুক্ত মনে করলাম।

বেতসাকে নিয়ে ফিরে এলাম আমাদের আস্তানায়। তখন আমার বাম বাহু থেকে রক্ত ঝরে পড়ছিল। বেতসা তার পদমর্যাদা ভুলে আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। তখন গব্বারামের নাক ডাকছিল। আমি বেতসাকে বললাম, তুমিই আমার প্রাণ রক্ষা করেছ বেতসা।

বেতসা কোনো কথা না বলে দৌড়ে চলে গেল পটাবাসের মধ্যে। জল এনে ভাল করে ধুইয়ে দিল আমার হাত। নিজের দামী ওড়নাখানা টেনে নিয়ে বাঁধতে গেলে আমি বললাম, একটু অপেক্ষা কর বেতসা, আমি আসছি।

ঢিবির পাশেই রক্ত বন্ধ করার গুণসম্পন্ন লতাগুল্ম আমি দেখেছিলাম। তাই এনে পেষণ করে ক্ষতে প্রলেপ দিলাম। আমি বাধা দেওয়া সত্ত্বেও বেতসা তার ওড়না জড়িয়ে বেঁধে দিল আমার হাত।

এবার বেতসা ঠেলে ওঠাল গব্বারামকে। সব শুনে গব্বা বলল, এখানে আর নয়, এক্ষুণি রওনা হয়ে যেতে হবে। এবার আমার স্থান হল রথে। রাত্রে পটাবাসের মধ্যে বেতসার আশ্রয়েই থাকতাম। গব্বা এ ব্যবস্থায় ভীষণ খুশী।

আমি কদিন আঘাতের তাড়নায় জ্বর ভোগ করেছি। এই কটি দিন সেবায়

যত্নে বেতসা আর গব্বা আমাকে ঋণী করে রেখেছিল। যখনই রাতে আমি জেগে উঠেছি তখনি আমার শিয়রে এক নারীকে জেগে বসে থাকতে দেখেছি। আমি রাত্রি জাগরণে নিষেধ করেছি বেতসাকে, অনুরোধ করেছি বিশ্রাম নেবার জন্য, কিন্তু আমার সমস্ত নিষেধ, অনুরোধকে সে চোখের জলে ভাসিয়ে দিয়েছে।

আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম, বেতসা মনে মনে কোনো এক অসম্ভবের কামনা করছিল। তার আচার আচরণ, সেবা যত্নের ভেতর এমন অতিরিক্ত এক ধরনের উত্তাপ ছিল যা আমাকে সচকিত করে তুলছিল।

দীর্ঘদিন একই রথে পাশাপাশি বসে পথ অতিক্রম করেছি আমরা, হৃদয় উজাড় করে গল্প করেছি, কথা বলে গেছি পরস্পর। আমার বাঁশির সুরে বেতসা কেঁদেছে। সামান্য কারণে আমার ওপর দুর্জয় অভিমানে নীরব থেকেছে কতক্ষণ। কিন্তু আমার যৌবনের রক্ত চঞ্চল হলেও আমার জাগ্রত বিবেককে কখনো তা প্লাবিত করেনি। আমার মনে হত, আমি বেতসার রক্ষীমাত্র। সম্রাট যে গুরু দায়িত্ব একান্ত বিশ্বাসে ও নির্ভরতায় আমার ওপর তুলে দিয়েছেন তা যথাযথ পালন করাই আমার কর্তব্য। যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, যে পরিবেশে আমি মানুষ হয়েছি সেখানে জীবনের প্রথম পাঠ ছিল সংযম। সর্ববিষয়ে নিজেকে সংযত না করলে একাগ্রতা লাভ সম্ভব নয়। চিত্ত একাগ্র হলেই যে কোনো বিষয়ে সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

আলাপে বেতসার সুনিপুণ চাতুর্য আমাকে মুগ্ধ করত। অর্জুনারয়ণে প্রচলিত লোককথা সে এমন দক্ষতার সঙ্গে বলে যেত যে আমি চোখের ওপর সেই সব চরিত্রকে অভিনয় করতে দেখতাম।

বেতসার হাসি, বেতসার অপাঙ্গ দৃষ্টি, এমন কি বেতসার কান্নাও আমি গভীর ভাবে উপভোগ করতাম।

এই নিবিড় সান্নিধ্য একদিন ভেঙে গেল। আমাদের রথ পাটলিপুত্রের প্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়াল। তখন আমি অশ্বারোহণে আর বেতসা রথের ভেতরে অবগুণ্ঠনবতী।

আমি জানতাম শেষের রাত্রিটি তার কেটেছে নিদ্রাহীন। শুধু নিদ্রাহীন নয়, নিরন্তর অশ্রুপাতে সিক্ত।

মন্ত্রিন্ (প্রধানমন্ত্রী), মহাদণ্ড নায়ক (প্রধান বিচারক), প্রাসাদে উপস্থিত ছিলেন। সম্রাটের পত্র তাঁদের হাতে তুলে দিলাম।

প্রধানমন্ত্রী পত্র পাঠ করে আমাকে মহাসমাদরে অতিথি নিবাসে অবস্থানের ব্যবস্থাদি করে দিলেন।

অন্তঃপুরের অভ্যন্তর থেকে শিবিকা এলো। রানীমহলের ক্রীতদাসীরা সেই শিবিকায় অবগুণ্ঠনবতী বেতসাকে বহন করে নিয়ে গেল অন্তঃপুরে। আমি জানতাম উৎসুক, সকরুণ দুটি চোখের দৃষ্টি শিবিকার অন্তরাল থেকে আমার ওপর আছড়ে পড়ছিল।

তিন

বিজয়ী সম্রাট ফিরে এসে মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন। উপঢৌকন নিয়ে এলো সিংহলরাজ মেঘবর্ণের প্রতিনিধি। এলো উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে শক, কুষাণ নরপতিদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিবৃন্দ। পূর্বে—কামরূপ, ডবাক, সমতট। উত্তরে নেপাল, পশ্চিমে পাঞ্জাবের যৌধেয়, মদ্রক। আর রাজপুতনা, মালব থেকে এলো রাশি রাশি উপঢৌকন। দক্ষিণের কোশলরাজ, মহাকান্তারের ব্যাঘ্ররাজ, কাঞ্চীর পল্লবরাজ, কেউ স্বয়ং উপস্থিত হলেন, কেউবা পাঠালেন প্রতিনিধি।

এই উপলক্ষে প্রচলিত হল নতুন সুবর্ণমুদ্রা। মহাযজ্ঞের স্মারক হিসেবে উৎকীর্ণ হল অশ্বমূর্তি।

সমবেত রাজন্যবর্গ ও রাজপ্রতিনিধিবৃন্দ যজ্ঞ শেষে সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের 'অশ্বমেধ-পরাক্রম' উপাধি নতমস্তকে স্বীকার করে নিলেন।

সভাকবি হরিষেণ সম্রাটের প্রশস্তি রচনায় নিযুক্ত হলেন।

সম্রাটের দিগ্বিজয় যাত্রা থেকে ফিরে আসার আগে আমি নালন্দায় বৌদ্ধ-গ্রন্থ পাঠ ও আলোচনায় যোগ দিয়েছিলাম। এ সম্বন্ধে আমার পূর্ব শিক্ষা অনেকখানি কাজে লেগেছিল। আমি হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের মৌলিক মিলন সূত্রগুলি নিয়ে একদিন সমবেত বিদ্যার্থী ও অধ্যাপকগণের সামনে আলোচনা করলাম। আচার্যদের সাধুবাদ ও বিদ্যার্থীদের উৎসাহ, উদ্দীপনা দেখে বুঝলাম, তক্ষশীলার শিক্ষা আমার ব্যর্থ হয়নি।

মহাযজ্ঞ সমাপ্ত হবার পর সম্রাট রাজকার্যে মন দিলেন। কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত। সারাদিন কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকার পর সন্ধ্যায় তিনি সবার কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতেন। এ সময় তিনি ডুব দিতেন তাঁর কলাসাধনার মধ্যে।

সন্ধ্যা নামলেই প্রতিহারিণী এসে আমাকে ডেকে নিয়ে যেত রাজ অন্তঃপুরে।

সম্রাট তখন বসতেন অন্তঃপুরের বৃত্তাকার অঙ্গনে। সেই অঙ্গনের দ্বিতল, ত্রিতল ঘিরে ছিল রানীমহল। বৃত্তাকার অঙ্গনটি পরিক্রমা করলে সর্বদিকে দাসী পরিবৃতা রানীদের কর্মচাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যেত।

সম্রাটের এই অন্তঃপুরে প্রবেশের একমাত্র অধিকার দেওয়া হয়েছিল আমাকে। আমরা দুজনে প্রায় এক প্রহরকাল সঙ্গীত সাধনায় মগ্ন থাকতাম।

আমি যখন বীণা অথবা বাঁশি বাজাতাম তখন গভীর অভিনিবেশ সহকারে শুনতেন সম্রাট, আবার সম্রাট যখন বাজাতেন তখন আমি মগধে প্রচলিত রাগিনীর

কলাকৌশল মনে মনে আয়ত্ত করতাম। এমনিভাবে দুজন অসম বয়সী সুরের জগতে বিচরণ করতাম অন্তরঙ্গ সুহৃদের মত।

একদিন ঊর্ধ্বে রানীমহলের দিকে তাকিয়ে বাঁশিতে ফুঁ দিয়েছি এমন সময় একটি গবাক্ষে আমার দৃষ্টি আটকে গেল। বেতসা আমার দিকে চেয়ে আছে। দুটি চোখে উদাসী মনের ছায়া। মুখে সকরুণ এক আর্তি। হাতে সন্ধ্যা প্রদীপ।

আমার বাঁশি থেকে সেদিন ঝরে পড়তে লাগল অবরুদ্ধা এক নারীহৃদয়ের কান্না। বাঁশি শেষ হলে তাকে আর দেখতে পেলাম না। সম্রাট আমার সেদিনের বাজনা শুনে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলেন।

আমি প্রতিহারিণীর মুখ থেকে কথায় কথায় জেনেছিলাম, অন্তঃপুরের গবাক্ষে এসে দাঁড়াবার অনুমতি একমাত্র দাসী অথবা উপস্থাপিকাদের দেওয়া আছে। রানীরা থাকেন প্রকোষ্ঠের অন্তরালে। দাসীরা সম্রাটের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পায় না, কিন্তু উপস্থাপিকারা প্রত্যক্ষভাবে সম্রাটের সেবায় নিযুক্ত থাকে। এরা সাধারণত পরাভূত রাজা কিংবা সামন্ত নৃপতিদের কন্যা। রানীদের পরেই এদের মর্যাদা। এদের কারু ওপর সম্রাট তুষ্ট হলে রানীর মর্যাদা দিয়ে থাকেন।

পর পর তিনদিন বীণা কিংবা বাঁশি বাজাতে গিয়ে আমি ঐ একই বাতায়নে বেতসাকে দেখলাম। সামনে তার একটি প্রজ্বলিত দীপ। চতুর্থ দিন কিন্তু তাকে আর আমি ঐ বাতায়নে দেখতে পেলাম না। আমার সমস্ত প্রেরণা সহসা নিভে যাওয়া দীপের আলোর মত অন্ধকারের সাগরে ডুবে গেল। বাঁশিতে আর সেদিন প্রাণের ছোঁয়া লাগল না। কুশলী বীণকার সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত বললেন, কুমার, তোমার সুর শুনলে আমার কল্পনার আকাশে অগণিত নক্ষত্রের ফুল ফুটে ওঠে, কিন্তু আজ সারা আকাশ জুড়ে মেঘের ছায়া কেন?

আমি চমকে উঠলাম, তীক্ষ্ণদর্শী মহারাজ আমার মনের কথা অনুমান করতে পারেননি তো।

সহসা আমার মুখ দিয়ে একটা কথা বেরিয়ে এলো, সম্রাট, সুরদেবী আজও এ অকিঞ্চনের গৃহ পরিত্যাগ করে আপনার প্রাসাদ শ্বারে উপস্থিত হয়েছেন।

সম্রাট হেসে উঠে বীণাটি তুলে নিলেন। সে রাতে তিনি হলেন সুরসাধক আর আমি হলাম তাঁর মুগ্ধ শ্রোতা।

পরদিন যথারীতি, প্রতিহারিণী এলো অতিথি নিবাসে। আমি প্রাসাদে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। কিন্তু প্রতিহারিণী আমাকে অবাক করে দিয়ে ভূর্জপত্রে লেখা একটি লিপি আমার হাতে দিলে। লিপিতে লেখা ছিল ঃ সখা, গত সন্ধ্যায় তোমার বাঁশি আমার প্রাণে এসে পৌঁছল না কেন? আমার মন বলল, তোমার মানসী বাতায়ন থেকে সরে আসার জন্যেই বিপর্যয়। তুমি একটি কথা জেনে রেখ, তিনটি দিবস সম্রাট কাটান এক রাণীর কক্ষে। চতুর্থ দিবসে

তিনি চলে যান কক্ষান্তরে, অন্য রাণীর প্রকোষ্ঠে। এমনি করে রাণীমহল পরিক্রমা চলে তাঁর। আমি এখন প্রাধানা উপস্থাপিকা, তাই যে রাণীর কক্ষেই তিনি যান না কেন আমাকে তাঁর সেবায় সেই কক্ষেই তিনদিন নিযুক্ত থাকতে হয়। মহারাজ যে কক্ষে নিশিবাস করবেন কেবলমাত্র সেই কক্ষের বাতায়নেই সন্ধ্যা থেকে দীপ জ্বলবে। সেখানে উপস্থিত থেকে তৈলদান ও শিখা সংবর্ধিত করাই আমার কাজ। তুমি সন্ধ্যার আসরে এসে বৃত্তাকার অঙ্গনটি প্রদক্ষিণ করলেই যে বাতায়নে দীপ দেখবে, জানবে সেখানেই আমি রয়েছি। তুমি সেই মুখেই তোমার আসন পাততে পার। আমিও তোমাকে মুখোমুখি দেখতে পাব।

ভয় পেয়ো না, পত্রবাহিকা প্রতিহারিণীটি অত্যন্ত বিশ্বস্তা।

তোমার পথসঙ্গিনী বেতসা।

আসরে পাতা থাকত পশমে তৈরি সুচিত্রিত এক আস্তরণ। তার ওপর উপবেশন করে আমাদের সঙ্গীত সাধনা চলত। আমি গিয়ে অঙ্গন প্রদক্ষিণ করে দেখে নিতাম আমার প্রেরণার দীপশিখাটি কোথায় জ্বলছে। সেই দিকে মুখ করে বসতাম। অঙ্গনটি বৃত্তাকার বলে যে কোন মুখেই বসা যেত। আমার উপবেশনের পর সংবাদ গেলে মহারাজ নেমে এসে আমার মুখোমুখি বসতেন।

এমনি করে দীর্ঘ দুটি বছর কেটে গেল। দিনান্তে একটিবার হলেও আমি বেতসাকে দেখতে পেতাম। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। ও ছিল আমার প্রেরণা। এর অধিক কোন ভাবনা বেতসাকে কেন্দ্র করে আমি ভাবিনি।

কিন্তু আমি জানতে পারিনি এই দুটি বছরের মধ্যে কি প্রবল ঝড় বয়ে গেছে আর একজনের মনের ওপর দিয়ে।

জানলাম এক শীতের রাত্রে। তখন মধ্যরাত্রি। দরজায় কে যেন করাঘাত করল। আমি জেগে উঠে দরজা খুলে দিলাম। কোন দুর্বৃত্ত যে আসেনি এ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত ছিলাম। কিন্তু আমাকে গভীর বিস্ময়ের মধ্যে ফেলে দিল একটা চাপা কণ্ঠস্বর।

দরজা বন্ধ করে দাও কুমার।

আমি মুহূর্তে দরজা বন্ধ করে দিলাম। কিন্তু সমস্ত শরীর আমার বায়ু-তাড়িত পত্রের মত থরথর করে কাঁপতে লাগল। মাঘের শেষ শীতের রাত্রে যখন সমস্ত নগরী গভীর নিদ্রায় মগ্ন তখন কৃষ্ণ অবগুণ্ঠনে সারা অঙ্গ ঢেকে প্রতিহারিণীর পরিচ্ছদ পরে সম্রাটের মোহর সঙ্গে নিয়ে অতিথি নিবাসে চলে এসেছে বেতসা।

উত্তেজনায় সেও যে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে তা তার শ্বাস-প্রশ্বাস থেকেই অনুমান করতে পারছিলাম।

তুমি! তুমি এ সময় এখানে বেতসা?

শুধু একটি কথা জানাতে এসেছি কুমার, তুমি এই পাষাণপুরী থেকে আমাকে

উদ্ধার করে নিয়ে চল। পৃথিবীর যে কোন ক্ষুদ্র প্রান্তে যেকোন অবস্থায় আমি তোমার সঙ্গে থাকতে চাই।

বেতসাকে আমার শয্যায় বসিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করলাম।

বললাম, আমরা তো প্রতিদিন পরস্পরকে দেখছি বেতসা। তাছাড়া সম্রাট অত্যন্ত মহানুভব, তাঁকে প্রতারণা করা কি সঙ্গত হবে? আমি জানি তিনি তোমার প্রতি গভীরভাবে আসক্ত। হয়তো অচিরেই তুমি উপস্থাপিকা থেকে রাণীর পদে উন্নীত হবে। যে কোন নারীর পক্ষে এ এক পরম সৌভাগ্য নয় কি?

হঠাৎ প্রশ্ন করল বেতসা, তুমি নারী হৃদয়ের কতটুকু জান কুমার?

স্বীকার করলাম, নারীহৃদয় সম্বন্ধে আমি সর্বজ্ঞ নই। তবু বললাম, সুস্থ-ভাবে কয়েকদিন চিন্তা করে দেখ, উত্তেজনা প্রশমিত হলে বুঝতে পারবে, এই পলায়নের পরিকল্পনা কতদূর অসম্ভব।

বেতসা তখনও বাঁচার প্রবল ইচ্ছায় স্রোতের তৃণটিকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা চালাতে লাগল।

কুমার, তুমি হয়তো ভয় পেয়েছ। সম্রাটের সামনে থেকে কি করে পলায়ন করবে তাই ভাবছ? কিন্তু তুমি হয়তো জাননা লিচ্ছবীদের উৎসবে যোগ দেবার জন্য অচিরেই সম্রাট যাবেন মাতুলালয়ে। সেই সুবর্ণ সুযোগে আমরা দুটি অশ্বে রাত্রে রাজধানী ত্যাগ করব। আমাদের প্রতিহারিণীটি আমার জন্য সবকিছু করতেই প্রস্তুত। অশ্বশালার রক্ষক আমাদের প্রতিহারিণীর প্রেমাসক্ত। সে অতি দ্রুতগামী দুটি অশ্ব দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

আমি বুঝলাম, সব আয়োজন ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ করে তবেই আমার কাছে এসেছে বেতসা। নিজের মনকে বহুদিনই আমি জিজ্ঞেস করেছি নিভৃতে, আমি কি বেতসাকে ভালবাসি? উত্তর পেয়েছি, হ্যাঁ।

আমি কি তাকে একান্ত করে কাছে পেতে চাই? উত্তর পেয়েছি, না।

আমার সংস্কৃত মন সম্রাটকে প্রতারণা করতে বার বার দ্বিধাবোধ করেছে।

অন্ধকারে বেতসা তার দুটো হাত দিয়ে আমার একখানা হাতকে জড়িয়ে ধরেছিল। আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম উত্তেজনায় ওর হাত দুটো কাঁপছে।

ভাবলাম, এই মুহূর্তে ওকে নিরাশ করলে ও চরম আঘাত পাবে, কিন্তু পরমুহূর্তে মনে হল, বৃথা সান্ত্বনা দিয়ে ওর আশাকে জিইয়ে রেখে লাভ কি! আমি কোনদিনই পারব না ওর পরিকল্পনাকে রূপ দিতে। আঘাত যদি প্রথমেই পায় তাহলে সে আঘাত হয়তো একসময় সামলে নিতে পারবে কিন্তু আমার কাছ থেকে ওর আশার স্বপক্ষে সামান্য সমর্থন পেলেও ওর কামনা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবে। তখন ওর মনের দুর্বার গতিকে ফেরান আর সম্ভব হবে না।

আমি আমার ভালবাসার নারীকে নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও বললাম, বেতসা, তুমি রাজার মেয়ে, সুন্দর সম্ভ্রান্ত তোমার আচরণ। কেবল আমি নই, ভারত সম্রাটও তোমার শোভন আচরণে মুগ্ধ। সামান্য প্রতিহারিণী, সেও দেখ

কি অসামান্য ভালবাসে তোমাকে। তোমার ভেতর এমন এক যাদু আছে যার শক্তিতে সকলেই সম্মোহিত। এ অবস্থায় শুধু মানসিক উত্তেজনার বশে তুমি যদি একটি মানুষকে নিয়ে পলায়ন কর তাহলে কি কৈফিয়ৎ দেবে নিজের কাছে। সবার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ালেও নিজের কাছ থেকে কি কোনদিন পালাতে পারবে বেতসা? তুমি যদি সম্ভ্রান্ত না হতে, তোমার মন যদি উচ্চ না হত তাহলে আমি এ প্রশ্ন তোমার কাছে রাখতাম না।

একটু থেমে আবার বললাম, দিনের পর দিন তোমাকে আমি মূর্তিমতী সন্ধ্যার মত দেখেছি প্রদীপ হাতে। আর তুমি আমাকে দেখেছ গন্ধর্বের ভূমিকায়। দুজনের হৃদয় দুজনের ছবি চিরভাস্বর হয়ে আছে। এবার দেহধারী একজনকে সরে যেতে দাও বেতসা। যে তোমার অক্ষত হৃদয়ে ক্ষতের সৃষ্টি করেছে তাকে ক্ষমা কর না। তার গৃহ নাই, সে পথের পথিক, তাকে নিঃশব্দে চলে যেতে দাও। তাকে ঘিরে সংসার রচনার কল্পনা কর না। আমি থামলাম। নিস্তব্ধ পরিবেশ। অন্ধকার গাঢ়তর বলে মনে হল।

সেই অন্ধকারে একটি নারী উঠে দাঁড়াল। তখনও সে ধরেছিল আমার হাত। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার বুক ঠেলে। কয়েকটি কথা সে উচ্চারণ করল। মনে হল শব্দগুলো কোন জনমানবহীন ধু-ধু দিগন্ত থেকে ভেসে আসছে।

মরুভূমি দেখেছ কুমার? বড় তৃষ্ণা, বড় তৃষ্ণা তার। বুক ফাটিয়ে সে চেয়ে থাকে আগুন ঢালা আকাশের দিকে। একখণ্ড মেঘ, শুধু একবিন্দু জলের প্রত্যাশা। কিন্তু হায়…।

বেতসার হাতখানা সহসা খসে পড়ল আমার হাতের থেকে। যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে চলে গেল গাঢ় অন্ধকারের অবগুণ্ঠনে নিজেকে ঢেকে নিয়ে।

বেতসা চলে গেলে কতক্ষণ একটা সম্মোহনের মধ্যে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হল, সবইঅ বাস্তব। এতক্ষণ স্বপ্নের মিথ্যা একটা জগতে আমি বিচরণ করেছি।

বিধাতার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার ছিল না। প্রভাতেই প্রাসাদ থেকে প্রতিহারী এসে জানিয়ে গেল, সম্রাট পক্ষকালের জন্য রাজধানী ত্যাগ করে যাচ্ছেন লিচ্ছবী রাজ্যে। ফিরে এসে তিনি শিল্পীকে যথারীতি আহ্বান জানাবেন।

আমি কি করে বেতসার দিকে মুখ তুলে তাকাব তাই যখন ভাবছি তখন এ সংবাদ বেশ কিছুটা স্বস্তি এনে দিল আমার মনে। পরক্ষণেই মন অশান্ত হয়ে উঠল। তবু দিনান্তে একটিবার তাকে দেখার সুযোগ ছিল কিন্তু তাও আর রইল না এখন।

আমি মনে মনে স্থির করে ফেললাম, পাটলিপুত্রের মায়া আমাকে কাটাতে

হবে। বেতসাকে যদি আমি সত্যই ভালবেসে থাকি তাহলে যত সত্বর সম্ভব তাকে ত্যাগ করে যেতে হবে আমাকে। এতে মঙ্গল দুজনেরই।

সম্রাট ফিরলেন ফাল্গুনের সপ্তম দিবসে। আরও সপ্তাহ কাল আমার কাছে কোন আহ্বান এল না প্রাসাদ থেকে।

আমি তখন চঞ্চল হয়ে উঠেছি সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য। পাটলিপুত্র ত্যাগের কথা তাঁকে অবিলম্বে জানাতে হবে।

আমার ধৈর্য যখন শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছে তখন প্রাসাদ থেকে প্রতিহারী এল সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাতের আহ্বান নিয়ে।

তখন মধ্যাহ্ন। সভাকক্ষে প্রভাতী অধিবেশনের সাময়িক বিরতি। প্রতি-হারীর সঙ্গে আমি প্রবেশ করলাম। সিংহাসনে বসে আছেন সম্রাট একাকী। আমি বুঝতে পারলাম, কেবলমাত্র আমারই অপেক্ষায় রয়েছেন তিনি।

কক্ষে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সাদর আহ্বান জানালেন সম্রাট। পাশের আসনে বসতে ইঙ্গিত করলেন। বন্ধুর মত হাস্যপরিহাসের মধ্যে আমার কুশল ইত্যাদি জেনে নিলেন।

এক সময় আসল কথাটি শোনালেন সম্রাট। আগামী বিশে ফাল্গুন রাজ-গৃহের (রাজগীর) পর্বত সংলগ্ন উদ্যানে প্রতি বছরের মত আয়োজন হয়েছে মদন মহোৎসবের। সেখানে মদনের অর্চনা ও সারাদিনের আনন্দ অনুষ্ঠান। সম্রাট ও অন্তঃপুরচারিকারা ছাড়া সে উৎসবে অন্য কোন পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। এতকাল এই নিয়মই বলবৎ ছিল কিন্তু এ বছর নিয়মের কিছু পরিবর্তন ঘটান হয়েছে।

সম্রাট বললেন, কুমার, তোমার জন্য এবার নিয়ম ভাঙলাম। তুমি যথার্থ গন্ধর্ব। তুমি বীণা বাজাবে মদন মহোৎসবে, আমার উৎসব তাতেই সার্থক হয়ে উঠবে।

আমি মাথা নত করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম।

এবার সম্রাট আমার কাছে যে কথাটি ব্যক্ত করলেন তার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। সুখ দুঃখের অতীত একটা অনুভূতি আমাকে অধিকার করে রইল।

সম্রাট বললেন, ঐ উৎসবের দিনে মদনের মন্দিরে বিগ্রহের সামনে পঞ্চপ্রদীপ জেলে আরতি করেন মহারাণীরা। পালাক্রমে এক এক রাণী মদনের পূজা সমাপ্ত করে সেই দীপের শিখায় আমার আরতি করে যান। আমি তাঁদের ললাটে আবীর তিলক পরিয়ে দি। এ বছর নতুন এক রাণী আমাকে বরণ করবে। তুমি তাকে চেন কুমার। বেতসাকে তুমিই তো এনেছিলে যৌধেয় থেকে। সে এতদিন ছিল আমার উপস্থাপিকা, তাকে আমি এই মদন মহোৎসবে রাণীর মর্যাদা দিতে চাই। মহারাণীর পদ লাভের পরিপূর্ণ যোগ্যতা আছে তার।

একটু থেমে বললেন, অবশ্য এ উৎসবে আমি তাঁকে বরণ করব, স্বীকৃতিও দেব, কিন্তু বৈদিক আচারে আমি তার পাণিগ্রহণ করব রাজধানীতে ফিরে।

এতগুলি কথা বলে থামলেন সম্রাট।

আমার কিছু বলার ছিল না। আমি সম্রাটের মুখের দিকে চেয়ে তাঁর প্রতিটি কথা শুনছিলাম। আমার হৃদয় আলোড়িত হচ্ছিল। আমি আমার প্রবৃত্তিকে শাসন করছিলাম। হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের কান্নাকে শুভবুদ্ধির তাড়নায় রূপান্তরিত করছিলাম প্রভাতের প্রসন্ন আলোকে।

নির্দিষ্ট দিনে সম্রাটের নির্দেশ মত আমি প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। শুভ্র একটি অশ্বের ওপর পীতবাস পরিধান করে, মস্তকে রক্ত উষ্ণীষ ও গলায় অশোক-মাল্য ধারণ করে আমি অপেক্ষা করছিলাম। প্রাসাদ থেকে পাঁচখানি রথ বেরুল। প্রতিটি রথের শীর্ষে উড়ছে মকরকেতন। মদনের আবির্ভাবের ঘোষণা উচ্চারিত।

সম্রাটের নির্দেশে আমি চলেছিলাম। রথের সম্মুখে। আমাদের অজস্র ধারায় স্নান করিয়ে দিচ্ছিল প্রভাত সূর্য। পথিপার্শ্বে বসন্তের বৃক্ষরাজিতে অজস্র রক্ত পুষ্পের সমারোহে বসন্তসখা মদনের আবির্ভাবের ইঙ্গিত।

আমরা রাজ-উদ্যানে এসে পৌঁছলাম। পূর্বদিনে দক্ষ পরিচারিকারা এসে অনুষ্ঠানের সবকিছু সম্পূর্ণ করে রেখেছিল।

মধুঋতুর পত্রপুষ্পে অতি সুশোভিত উদ্যান। পশ্চাতের পটভূমিতে ধূমল পর্বত নীল আকাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। উদ্যানের মাঝে সাময়িক ভাবে নির্মিত হয়েছে মদনের মন্দির। শীর্ষে ধ্বজদণ্ডে পুষ্প নির্মিত একটি ধনু থেকে পঞ্চমুখী শর নির্গত হবার জন্য উদ্যত।

শুরু হয়ে গেল উৎসব। সুসজ্জিত রাজনর্তকীর দল মণ্ডলাকারে নৃত্য করতে করতে প্রদক্ষিণ করতে লাগল পুষ্পিত, মুকুলিত আম্র, অশোক, কিংশুক

ওদের সম্মেলক সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে আমি কখনো বাঁশি কখনো বা বীণা বাজাতে লাগলাম।

প্রথম উদ্বোধন-পর্ব শেষ হলে শুরু হল আসল অনুষ্ঠান।

পুষ্প দিয়ে গড়া বেদীর ওপর কুসুম, পল্লব শোভিত সিংহাসনে বসে রয়েছেন সুসজ্জিত সাক্ষাৎ-মদন সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত। বিশিষ্ট সেবিকারা পুষ্পে গড়া ব্যজন আন্দোলন করছে সম্রাটের দুইদিকে। একজন মহারাজের মস্তকে ধরে আছে পুষ্পপত্র নির্মিত ছত্র।

প্রধানা মহিষী প্রথমে মন্মথ মন্দিরে প্রবেশ করে দ্বার রুদ্ধ করলেন। মদনের সম্মুখে এইভাবে হবে রুদ্ধ দ্বারের অভ্যন্তরে নিভৃত আরতি। তারপর পূজা শেষে দীপ হস্তে বেরিয়ে এলেন মহিষী।

আমি সারাক্ষণই বীণায় বসন্তের বিহ্বল রাগিণী বাজিয়ে চলেছিলাম।

মহিষী অনিন্দ্য ভঙ্গীতে সম্রাটের আরত্রিক কর্ম সমাধা করলেন। সম্রাটও স্বর্ণ থালিকা থেকে আবীর তুলে নিয়ে তিলক এঁকে দিলেন মহিষীর ললাটে। চতুর্দিক থেকে পুষ্প বর্ষণ চলল কিছুক্ষণ।

এমনি করে একে একে রাণীরা মন্দিরের সন্নিকটে স্থাপিত পটাবাস থেকে বেরিয়ে মদনের আরাত্রিক সমাধা করলেন নিভৃতে, তারপর সম্রাটকে আরতি করে, তাঁর তিলক মাথায় নিয়ে বসলেন বেদীর ওপর।

সব শেষে পটাবাস থেকে বেরুল বেতসা। রক্তবর্ণের চীনপট্ট আর রক্তবর্ণের পুষ্পালঙ্কারে তার উজ্জ্বল স্বর্ণকান্তি অগ্নিশিখার মত দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। তাকে সাজান হয়েছিল নববধূর বেশে। তার বাম হাতে স্বর্ণ থালিকায় ছিল পুষ্পার্ঘ্য।

দ্বাররুদ্ধ করার আগে বেতসা একবার পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকাল সম্রাটের বেদীর দিকে। আমার স্থির বিশ্বাস সে আমারই দিকে চেয়েছিল। তার চোখে কিসের দৃষ্টি আমি দেখেছিলাম? ভর্ৎসনা, অনুরাগ না সর্বশূন্যতা?

দ্বার রুদ্ধ হল। আমি আজ কি রাগিণী বাজাব? কি সুর তুলব আমার বীণায়? ওকে যে আজ আমার সবসেরা রাগিণীটি বাজিয়ে শোনাতে হবে।

আমি আমার সকল শিক্ষা, সমস্ত প্রাণ ঢেলে বাজিয়ে চললাম। বসন্ত প্রকৃতি সে সুরের স্পর্শে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল।

কতক্ষণ রুদ্ধ রইল মন্দিরের দ্বার। সহসা সভয়ে আর্তনাদ করে উঠল সেবিকার দল। সচকিত হয়ে সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন সম্রাট। আমি বীণাবাদন থামিয়ে বিহ্বলের মত চেয়ে রইলাম।

ততক্ষণে মন্মথ মন্দিরের ধ্বজা স্পর্শ করেছে লেলিহান অগ্নিশিখা।

চতুর্দিকে আর্ত কলরব, অগ্নি নির্বাপণের জন্য উদ্‌ভ্রান্ত চেষ্টা, সব কিছু ব্যর্থ হয়ে গেল। বংশ ও শুষ্ক তৃণ নির্মিত মদনমন্দির সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেল দৃষ্টির সম্মুখে। প্রবল হাহাকার ধ্বনির মধ্যে হারিয়ে গেল বেতসা।

কাহিনী শেষ করে থামল কুমারায়ণ। শুকতারা পূর্ব দিগন্তে চেয়ে আছে। জীবাও ঐ তারাটির মত কতক্ষণ চেয়ে রইল কুমারায়ণের মুখের দিকে। এক-সময় কুমারায়ণের হাত ধরে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ভোর হয়ে এসেছে, চল কুমার, যাত্রার আয়োজন করি।

চার

দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল গোদানের (খোটান) রাজপ্রাসাদ। কাষ্ঠনির্মিত ত্রিতল, পঞ্চতল গৃহগুলি পতাকা-শোভিত। প্রাসাদশীর্ষে স্থানে স্থানে পিত্তলের কলসাকৃতি চূড়াগুলি রৌদ্রালোকে জ্বলছিল।

জীবা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, দেখ দেখ, কি বিস্ময়! শ্বেত পারাবতগুলি সূর্যের আলো পাখায় মেখে চক্রাকারে বৌদ্ধবিহারের স্তূপ শীর্ষে উড়ে ফিরছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে ঠিক যেন একটি শ্বেত ছত্র।

তারা যতই প্রাসাদের দিকে এগিয়ে চলেছিল, উৎসবের চিত্র ততই তাদের চোখে এসে পড়ছিল। বিভিন্ন দিকের পথ গোদান নগরীর রাজপথে গিয়ে মিশেছে। পথের মাঝে মাঝে নির্মিত হয়েছে বৌদ্ধস্তূপের আকারে তোরণ। বাতাসে উড়ছে নানাবর্ণের পতাকা। চোক্কুর (ইয়ারকন্দ) থেকে বুদ্ধযাত্রায় যোগ দিতে চলেছেন কয়েকজন ভিক্ষু। শূলিদেশ (কাশগড়) থেকে আসছে একদল অতি সাধারণ মানুষ—বাল, বৃদ্ধ, যুবা, নারী, পুরুষ। সম্ভবত তারা এক পরিবারভুক্ত। জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেল, তারা অন্ত্যজ শ্রেণীর লোক। বুদ্ধের কাছে জাতিভেদ নেই, তাই তারা এতদূর পথ পেরিয়ে এসেছে বুদ্ধযাত্রায় যোগ দিতে। সকলের মুখে সেই এক মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে ঃ

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধম্মং শরণং গচ্ছামি
সংঘং শরণং গচ্ছামি।

জীবা বলল, গোমতী বিহারে মহাশ্রমণ ধর্মমতির সঙ্গে আমরা প্রথম দেখা করব, তারপর প্রবেশ করব নগরে।

কুমারায়ণ মাথা নেড়ে বলল, সেই ভাল। একজন পরিচিত মানুষের দেখা পেলে অনেক সুবিধে।

নগরীর বাইরে পথের ওপর বসে গেছে সাময়িক দোকানপাট। দূর দূর থেকে বণিকরা এসেছে তাদের পণ্য-সম্ভার নিয়ে। তারা অস্থায়ী আস্তানা পেতে সম্ভাব সাজিয়ে বসেছে। চোক্কুকের ব্যবসায়ীরা বেশিরভাগ দিয়েছে খাবারের দোকান। ভারতীয় ব্যবসায়ীদের আলাদা এলাকা। সাত আটখানি দোকান পাশাপাশি। তারা এনেছে, বঙ্গ থেকে অতি সূক্ষ্ম ও মসৃণ বিলাসবস্ত্র। বারাণসী থেকে অতি বর্ণাঢ্য ও স্বর্ণসূত্রের কাজকরা পত্রোর্ণ (রেশমী বস্ত্র)। গজদন্ত নির্মিত ময়ূরপঙ্ক্ষী, নর্তকী ও সুসজ্জিত হস্তীর মূর্তি সাজিয়ে রেখেছে। মুক্তা, হীরক ও মূল্যবান প্রস্তরগুলি প্রদর্শিত হচ্ছে। এইসব দ্রব্যের ক্রেতা সাধারণত বিদেশী বণিক। তারা নিজ নিজ দেশের বাজারের জন্য সংগ্রহ করছে এসব।

পারস্য থেকে এসেছে চিত্র-সম্ভার ও পশমী পরিচ্ছদ। চীনদেশ থেকে প্রধানত চীনাংশুক।

মেলার বাইরে বিভিন্ন দেশের বণিকদের অবস্থানের জন্য স্থাপিত হয়েছে বহু ধরনের পটাবাস। রাত্রে চৈনিক বণিকেরা তাদের শিবিরের সামনে নাটকের অনুষ্ঠান করে। নাচে, গানে, কথায়, যুদ্ধে সে এক জমজমাট ব্যাপার। ভাষা না বুঝলেও উপস্থিত সকলেই উপভোগ করে সে অভিনয়।

তাছাড়া প্রতি দেশের মানুষেরই নিজস্ব কিছু আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা আছে। সারাদিনের পর পটাবাসের মধ্যে বসে তারা সেইসব আনন্দে মেতে থাকে।

জীবা, মহাশ্রমণ ধর্মমতির সঙ্গে নিভৃতে দেখা করে তার প্রয়োজনীয় কথাগুলি

বলে নিল। তিনি তাকে তাঁর কালোচিত উপদেশ দিলেন! প্রত্যাবর্তনের সময় কুচীশ্বরের কাছে পত্র দেবেন বলেও জানালেন।

এরপর গোদানের মহারাজার কাছে জীবার আগমন সংবাদ পাঠালে তিনি শিবিকা পাঠিয়ে মহাসমাদরে জীবাকে অন্তঃপুরে নিয়ে গেলেন। কুমারায়ণকেও মহারাজ অমিত্রবিজয় প্রাসাদের অতিথি নিবাসে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু ধর্মমতি তাকে গোমতী বিহারে নিজের কাছে রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করায় মহারাজ ক্ষান্ত হলেন।

ধর্মমতি বিস্মিত হলেন কুমারায়ণের সঙ্গে আলাপ করে। শাস্ত্র বিষয়েই কেবল যুবকটি সুপণ্ডিত নয়, ব্যবহারিক বহু বিদ্যাতেই সে পারঙ্গম।

ধর্মমতি কুমারায়ণেব সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর এক সময় তাকে বললেন, যুবক তুমি বৌদ্ধশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছ, কিন্তু গৃহীর জীবনই তোমাকে যাপন করতে হবে।

কুমারায়ণের প্রশ্ন, কেন প্রভু ?

এ কেনর উত্তর নেই কুমারায়ণ, আমার অভিজ্ঞতা থেকেই তোমার জীবন সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তে এসেছি। তুমি গৃহীর জীবন গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থেকো, মঙ্গল হবে তোমার।

কুমারায়ণ আর প্রশ্ন না তুলে অবনত মস্তকে বসে রইল। এই জ্ঞানবৃদ্ধ, বহুদর্শী সাধক পুরুষটির প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা জন্মে গিয়েছিল। সেই মুহূর্তে তার মনে হল, মহাস্থবির ধর্মমতির এই বাণী অমোঘ।

সে এ বিষয়ে আর কিছু চিন্তা করল না। ভাগ্যের অনিবার্য বিধানের হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়াই শ্রেয় বলে মনে করল।

তিরিশ হস্ত উচ্চতা-বিশিষ্ট রথটি যেন চলন্ত এক বৌদ্ধ বিহার। চীনপট্টের চাঁদোয়া টাঙানো হয়েছে রথের মধ্যে। পীত, শুভ্র ও গৈরিক বর্ণের পতাকায় সমস্ত রথটি সুশোভিত।

রথের মধ্যদেশে ধ্যানমুদ্রায় বসে আছেন রজত নির্মিত বুদ্ধ। তাঁর দুই পার্শ্বে দুই বোধিসত্ত্ব মূর্তি।

নগরের বহির্দ্বার দিয়ে প্রবেশ করল রথ। রথের সামনে রজ্জু ধরে আকর্ষণ করতে করতে এগিয়ে আসছেন গোমতী বিহারের শত শত ভিক্ষু। মুণ্ডিত মস্তক, পীতবসন পরিহিত।

নগরে রথ প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলবাদ্য বেজে উঠল। উত্তাল জনতা বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের জয়ধ্বনি দিতে লাগল।

মহারাজ অমিত্রবিজয় নগ্নপদে সপারিষদ এগিয়ে এলেন। পরিধানে ধৌত বস্ত্র, হাতে গন্ধ ধূপ। তিনি রথের কাছে এসে মাথার মুকুট নামিয়ে রাখলেন। ভক্তিভরে অর্চনা করে নগরের অভ্যন্তরে আকর্ষণ করে আনতে লাগলেন রথ।

বুদ্ধের রথ প্রাসাদ সংলগ্ন পথে আসা মাত্র মহারানীরা গবাক্ষ পথে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। জীবাও অমৃতময় বুদ্ধের নাম উচ্চারণ করে পুষ্প বর্ষণ করল। সেই মুহূর্তে হূন দস্যুদের দ্বারা হত রক্ষীদের কথা স্মরণে আসায় দু'ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে। মনে মনে সে আবৃত্তি করল, হে প্রভু, এ বিশ্ব থেকে তোমার নামে যেন হিংসা বিদূরিত হয়।

কিছু সময় প্রাসাদের কাছে থেমে দাঁড়াল রথ। মহাস্থবির ধর্মমতি উচ্চারণ করতে লাগলেন বুদ্ধের অমৃত বাণী : 'মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং। উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ অসম্বাধং অবেরমসপত্তং'—ঊর্ধ্বে অধোতে চারদিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাহীন হিংসাহীন শত্রুতাহীন অপরিমিত মানস এবং মৈত্রী রক্ষা করবে।

মন্ত্রের মত জনসমুদ্র সেই বাণী উচ্চারণ করতে লাগল। রথ এবার এগিয়ে চলল নগরীর পথ ধরে। প্রতি গৃহ ও পথপার্শ্ব থেকে রথের ওপর বর্ষিত হতে লাগল রাশি রাশি ঋতু-পুষ্প।

গোদানে বুদ্ধযাত্রা উৎসব সমাপ্ত হলে কুচীর উদ্দেশে রওনা হল জীবা আর কুমারায়ণ। মহারাজ অমিত্রবিজয় জীবার জন্য রক্ষীর ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জীবা তাতে সম্মত না হওয়ায় মহারাজ তাদের দুজনের জন্য দুটি অশ্ব দিলেন। সঙ্গে এসেছিল যে শ্বেত অশ্বটি তাতে পটাবাস ও যাবতীয় খাদ্যসামগ্রী বয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হল।

গোমতী বিহারে মহাশ্রমণ ধর্মমতির আশীর্বাদ ভিক্ষা করে নিল তারা। এবার দুজনে ধরল ভিন্ন পথ। চোক্কুক, শূলি ও ভুরুকের সার্থবাহ চিহ্নিত পথ।

দীর্ঘ পথযাত্রায় জীবা আর কুমারায়ণ পরস্পরের অনেক কাছে সরে এলো। কুমারায়ণের স্মৃতিতে অস্পষ্ট হয়ে এলো বেতসার মূর্তি। কুমারায়ণ বেতসাকে ভালবেসেছিল ঠিক কিন্তু তাকে নিয়ে সংসার রচনার কল্পনাও করেনি। সে জানত এ অসম্ভব। সম্রাট যাকে গ্রহণ করেছেন তাকে যৌবনের উম্মাদনায় হরণ করে নিয়ে যাওয়া শুধু অন্যায় নয়, পাপ। আর যেহেতু সম্রাট তার শত্রু নন সেজন্যে তাঁর কাছ থেকে তাঁর সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে যাবে কোন দুর্বুদ্ধির তাড়নায় ?

তবু জীবার সঙ্গে প্রথম প্রণয়ের মুহূর্তগুলোতে বার বার কুমারায়ণের চোখের ওপর বেতসার মুখ ভেসে উঠেছে। কখনো কখনো মনে হয়েছে জীবা নয়, অবিকল বেতসা চলেছে, তার পাশে পাশে। আর তারা শূলি দেশের পথে নয়, শ্রাবস্তীর পথ ধরেই চলেছে।

এই মায়া-দৃষ্টি কেটে যেতে বেশি সময় লাগেনি কুমারায়ণের। বর্ষার মেঘ সরে গিয়েও যেমন শরতের আকাশে তার ছায়া রাখে, তারপর হেমন্তের অবগুণ্ঠনের আড়ালে অবলুপ্ত হয়ে যায়, কুমারায়ণের মনে বেতসার স্মৃতিও তেমনি ধীরে ধীরে

উজ্জ্বল থেকে ধূসর হয়ে গেল।

কথা হয় জীবা আর কুমারায়ণের। একের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে অন্যের হৃদয়ে।

কুমার প্রশ্ন করে, আচ্ছা জীবা, আমাদের এই মিলনে তোমার বান্ধবীর কাছ থেকে কোনো বাধা আসবে না তো ?

জীবা বলে, বান্ধবীর কাছ থেকে বাধা না এলেও তোমার জীবার কাছ থেকে আসবে।

বিস্মিত হয় কুমারায়ণ, একথা কেন জীবা ?

কারণ সে যে আমার অভিন্ন হৃদয়। তাকে অনূঢ়া রেখে আমাদের মিলন কি সম্ভব ?

তোমার বান্ধবীর মিলনবাসর হয়ে গেলে পর, আমরা মিলিত হব। তার আগে নয়।

সহসা উচ্ছ্বসিত হয় জীবা, জান কুমার, ছোটবেলা আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম একই মানুষকে দুজনে বরণ করব।

সরস হয়ে ওঠে কুমারায়ণের জিহ্বা। বলে, এখনও কি সেই বাসনা ?

অমনি জীবা বলে, আমার মন থেকে এখনও প্রতিজ্ঞা মুছে যায়নি কুমার।

আশ্চর্য বন্ধুত্ব তোমাদের। আমি তো ভাবতেই পারি না আমার ভালবাসার ধনকে আমি অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নেব।

জীবা হেসে বলল, এমন বন্ধুত্ব ত্রিভুবনে যে কোথাও নেই তা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে।

আমি বিস্মিত, তবু মানছি জীবা।

এবার ভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণা করে জীবা, আমার ভেতর তুমি কি এমন দেখেছ কুমার যা তোমার মনকে আমার দিকে টেনে এনেছে ?

বেশ কিছুক্ষণ জীবার দিকে চেয়ে থেকে কুমারায়ণ বলে, তোমার ঐ দুটি নীল চোখের তারায় আকাশ দেখেছি আমি। তারপর সোনালী সূর্যের অনেক লেখা দেখেছি সে আকাশে।

আমার চোখেই কি শুধু তোমার আমন্ত্রণ ছিল কুমার ?

তোমার কথায়, তোমার চিন্তায়, তোমার অভিজাত ব্যবহারে আমার নিজের ছায়া দেখেছি, এ আমার মনের কাছে দ্বিতীয় আমন্ত্রণ জীবা। বলতে পার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ, অপ্রতিরোধ্য।

আমি তোমার কি দেখে ভালবেসেছি জান ? শুধু তোমার দিকে চেয়ে।

শুধু আমার দিকে চেয়ে ?

হ্যাঁ কুমার। মরুদ্যানের সেই বিভীষিকার কথা ছেড়ে দিলে আমি প্রথম যখন তোমাকে পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখি তখন মনে হয়েছিল আমি যেন একটি কাচ-খণ্ডের ভেতর দিয়ে এপার ওপার দেখছি।

একটু থেমে আবার বলল, তেমনি স্বচ্ছ, তেমনি নির্বাধ।

আবার তেমনি ভঙ্গুরও, হাসতে হাসতে বলল কুমারায়ণ।

না কুমার, স্বচ্ছতার ভেতর যে সহজ শক্তি থাকে সেখানে তুমি অপরাজেয়। সে পৌরুষ অর্জন করতে হয় না, সে সহজাত।

ওরা কিজিল নদী পেরিয়ে আসে। ঘোড়ার পায়ে বাধা পেয়ে বরফ গলা জলে মুক্তো ছড়ায়। ওরা পাশাপাশি চলে ঘোড়া ছুটিয়ে, আবার কখনো ধীরে ধীরে, হাতে হাত স্পর্শ করে।

চলার পথে জীবা জানতে চায়, কুমার এমন কোন চরিত্রের কথা শোনাও যা তোমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে।

একটু ভেবে নিয়ে কুমারায়ণ বলে, এই মুহূর্তে একটি চরিত্রের কথা আমার মনে পড়ছে জীবা। অসাধারণ এক পুরুষ।

অসাধারণদের কথা শুনতে আমি ভালবাসি কুমার।

তক্ষশীলায় আমার ধনুর্বিদ্যার গুরু ভবদেবের কথাই বলব। বিদ্যাশিক্ষার শেষে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে আসার আগে গুরুদক্ষিণা দেবার জন্য তাঁর কাছে যাই। তিনি বললেন, যা চাই তা দিতে পারবে?

আমরা বললাম, সাধ্যমত চেষ্টা করব গুরুদেব।

আগে শোন একটা কাহিনী। এক রাজকুমার তীরধনু নিয়ে শিকার করে বেড়াত। একদিন বনের সবুজ লতাপাতার আড়ালে দুটো আশ্চর্য সুন্দর চোখ দেখতে পেল। সে-দুটো অবাক-করা-চোখ তার দিকেই চেয়ে ছিল। রাজকুমারের শিল্পীমন সব ভুলে ঐ চোখের দিকে চেয়ে রইল। কিন্তু হঠাৎ এক-সময় রাজকুমারের ভেতর শিল্পীকে হত্যা করে জেগে উঠল একটা ব্যাধ। সে ধনুতে শরযোজন করে নিক্ষেপ করল হরিণটির এক চক্ষু লক্ষ্য করে। সেই তীরবিদ্ধ চোখ নিয়ে তরুণ হরিণটি প্রান্তর পেরিয়ে দৌড়তে লাগল। একবার মাটিতে গড়িয়ে পড়ে আবার প্রাণ নিয়ে লাফিয়ে পালায়। একসময় সে বনান্তরে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু আবার ফিরে এলো সে। প্রতি রাত্রে রাজকুমারের স্বপ্নের ভেতর। সে রাজকুমারের সামনে এসে দাঁড়ায়। শুধু চেয়ে থাকে তার দিকে। রাজকুমারের নিক্ষিপ্ত তীর বিদ্ধ হয়ে আছে তার বাম চোখে। হরিণটি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তার চোখের ভাষায় যা বলে তার অর্থ, তুমি নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাও আর আমি মৃত্যু যন্ত্রণা চোখে নিয়ে বনে কান্তারে ঘুরে বেড়াই। তুমি যদি আমার মত তীরবিদ্ধ হতে তাহলে বুঝতে আমার যন্ত্রণা।

আজও সে প্রতিরাত্রে আসে সেই রাজকুমাররূপী ব্যাধের কাছে।

থামলেন গুরু ভবদেব।

আমি জানতাম, ভবদেব এক রাজার পুত্র ছিলেন। স্বেচ্ছায় রাজ্য ত্যাগ করে তক্ষশীলায় ধনুর্বেদের আচার্য পদ নিয়ে চলে এসেছেন।

বললাম, গুরুদেব, একি আপনার আত্মকাহিনী?

হাসলেন গুরু। বললেন, এবার দক্ষিণা চাইব। আমার জন্য নয়, ঐ হরিণটির আত্মার শান্তির জন্য।

সবাই আমরা তাঁকে সাধ্যমত দক্ষিণা দেবার প্রতিশ্রুতি দিলাম।

এবার আমাদের গভীর বিস্ময়ের মাঝে ফেলে গুরু ভবদেব বললেন, ঐ যে লতাপত্রে আচ্ছাদিত স্থানটি দেখা যাচ্ছে, আমি ওর আড়ালে গিয়ে দাঁড়াব। শুধু আমাব মুখ আর দুটি চক্ষু তোমরা দেখতে পাবে। এখন বল তোমাদের ভেতর কে আমার বাম চক্ষুর তারায় তীরবিদ্ধ করতে পারবে ?

সবাই আমরা অধোবদনে দাঁড়িয়ে রইলাম।

গুরু বললেন, আমি অন্য কোন দক্ষিণা চাইনা। তোমাদের কাছে। তোমরা গৃহে ফিরে যাও। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হও, এই আশীর্বাদ করি। কল্যাণ হোক তোমাদের।

সবাই আমরা গুরুকে প্রণাম করে ফিরে এলাম।

পরদিন ভোরে যে যার নিজ নিজ দেশের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল। আমি কিন্তু পথে নেমেও যেতে পারলাম না। ফিরে গেলাম গুরু ভবদেবের ভবনে।

আমাকে দেখেই গুরুর মুখে পরিতৃপ্তির হাসি দেখা দিল। তিনি বললেন, আমি জানতাম তুমি আসবে। আর তুমিই পারবে আমার শাপমোচন করতে।

আমি তখন চোখের জলে ভাসছি। গুরু কাছে টেনে নিয়ে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আমার চোখের জল মুছিয়ে দিলেন।

বললেন, আমার পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা কেউ নেই, তুমিই আমার সব। আমি আমার সাধনায় আয়ত্ত শেষ শরক্ষেপণের কৌশলটিও একমাত্র তোমাকেই শিখিয়ে দিয়েছি। তুমি আমাকে গুরু দক্ষিণা দিযে যাবে এই প্রত্যাশা নিয়ে আমি তোমার দিকে চেয়ে বসে আছি কুমারায়ণ।

একি আমার পাপ নয় গুরুদেব ?

গুরুকে পাপ থেকে মুক্ত করে দেবার মত পুণ্যকর্ম আর কি হতে পারে কুমারায়ণ।

অস্থির হয়ে জীবা প্রশ্ন করল, তুমি তীরবিদ্ধ করলে ?

করেছিলাম জীবা। তবে বাম আঁখির তারায় আমার তীরের সূক্ষ্মাগ্র একটি তন্ডুলের পরিমাপে প্রবেশ করে ভূমিতে পতিত হয়েছিল। আশ্চর্য ! গুরুর মুখে যন্ত্রণার কোন চিহ্ন ফুটে উঠতে আমি দেখিনি।

পরে শ্রেষ্ঠ ভেষজবিদ সোমপ্রভের চিকিৎসায় তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। যদিও বাম চক্ষুর দৃষ্টি তিনি আর ফিরে পাননি।

জীবা বলল, সত্যি, এক অসাধারণ ব্যক্তির অদ্ভুত প্রায়শ্চিত্ত।

কুমারায়ণ বলল, বণিক দলের সঙ্গে ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে আসার আগে আমি গুরু ভবদেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আমার প্রায়শ্চিত্ত সার্থক ও সম্পূর্ণ হয়েছে কুমার। রাত্রে সেই তীরবিদ্ধ

হরিণ আর আমাকে স্বপ্নে দেখা দিতে আসে না। আমি নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাই।

এইখানেই থামল কুমারায়ণ। এক সময় বলল, তোমাদের দেশে গুরুকে দক্ষিণা দেবার রীতি নেই জীবা ?

আছে বইকি। আমরা তো ভারতীয় আদর্শে দীক্ষিত ও শিক্ষিত। আমরা রোম দেশের মানুষ। বহু শতাব্দী আগে আমাদের পূর্বপুরুষ যাযাবর হয়ে কুচীতে আর অগ্নিদেশে এসে বসবাস করে। তারপর প্রায় পাঁচশত বছর আগে ভারত থেকে ভিক্ষুরা এসে আমাদের দীক্ষা দেন। সেই থেকে আমাদের নিজস্ব কুচীর ভাষার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সংস্কৃত আর প্রাকৃত ভাষা শিখে থাকি। হাঁ, তুমি গুরু দক্ষিণার কথা বলছিলে না ? আমি গুরু ধর্মমতির কাছে বৌদ্ধ শাস্ত্র পাঠের শেষে দক্ষিণা দিতে চাই। তিনি বললেন, আমি এখন দক্ষিণা নেব না, আমার সঙ্ঘ নেবে।

বললাম, কবে আমার সে সৌভাগ্য হবে প্রভু ? আর কি বস্তু দক্ষিণা রূপে পেলে আপনার সঙ্ঘের তৃপ্তি ?

গুরু বললেন, তুমি যখন সংসারে প্রবেশ করে জননীপদ লাভ করবে তখন তোমার প্রথম পুত্র সন্তানটি সঙ্ঘে দক্ষিণারূপে দিও।

কি উত্তর দিলে তুমি জীবা ?

কুমারায়ণের একটি হাত নিজের দুটি হাতের মধ্যে ভরে নিয়ে তার চোখে চোখ রেখে জীবা বলল, আমি গুরুকে উত্তর দিয়েছিলাম, সে আমার পরম সৌভাগ্য।

কুমারায়ণ বলে উঠল, তোমার দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হবে জীবা।

ক্ষণকাল থেমে আবার বলল, এই মুহূর্তে ক্ষুদ্র একটি পরিকল্পনা আমার মাথায় এসেছে। তুমি অভয় দাও তো বলি।

নির্ভয়ে বল, আমার কাছে তোমার গোপন কিছু তো থাকতে পারে না কুমার।

কুমারায়ণ বলল, যদি আমাদের প্রথম পুত্রসন্তান হয় তাহলে তার নামের সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে আমাদের দুজনের নাম। সে যদি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ হিসেবে কোনদিন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তাহলে পুত্রের নামের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও লাভ করব অমরত্ব।

জীবা তন্মগত হয়ে বলল, প্রভু তথাগত যেন আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করেন। কুমার, এখন বল কি সে নাম, যার ভেতর আমরা দুজনেই জড়িয়ে থাকতে পারি ? সন্তানের মধ্যে জনক-জননী।

কুমারজীব।

দুটি চোখ বন্ধ করে কতক্ষণ বসে রইল জীবা। এক সময় চোখ মেলে কুমারায়ণের দিকে চেয়ে বলল, অপূর্ব ! অপূর্ব তোমার নামকরণ। কুমার দেখ, আমাদের সন্তান কুমারজীব একদিন প্রভুর কৃপা লাভ করে জগৎবিখ্যাত হয়ে উঠবে।

পাঁচ

কুচী নগরী উৎসব-সজ্জায় সেজেছে। রাজকন্যা তথা রাজভগিনীর স্বয়ম্বরা। কুচীতে স্বয়ম্বরার অনুষ্ঠান এই প্রথম ধর্মগুরু মহাস্থবির ধর্মমতি জীবার হাতে পত্র দিয়ে মহারাজ রজতপুষ্পকে এই স্বয়ম্বর অনুষ্ঠান করার জন্য পরামর্শ দান করেছেন।

পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে উন্মাদনার অন্ত নেই। মহারাজ রজতপুষ্প প্রতিটি রাজ্যে ভগিনীর স্বয়ম্বরার জন্য নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছেন। কেবল পার্শ্ববর্তী রাজ্যে নয়, সুদূর চীনেও দূত গেছে আমন্ত্রণপত্র নিয়ে।

যথাসময়ে এক একজন রাজপুত্র অথবা রাজার প্রেরিত সেনাপতি কুচীতে উপস্থিত হয়ে কুচীশ্বরের মহা সমাদরপূর্ণ আতিথ্য গ্রহণ করেছেন।

অগ্নিদেশের যুবক রাজা এই স্বয়ম্বরের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে এসেছেন। রক্তসূত্রে অগ্নিদেশের মানুষেরা কুচীর জ্ঞাতিস্থানীয়। তাই অগ্নিদেশের রাজার কাছ থেকে বারে বারে প্রস্তাব এসেছে কুচীশ্বরের ভগিনীর পাণি প্রার্থনা করে। কিন্তু রাজভগিনী কর্ণপাত করেননি এ প্রস্তাবে। তিনি লোকমুখে সংবাদ পেয়েছেন অগ্নিদেশের রাজা অত্যন্ত ক্রূরমনা ও সংগ্রামপ্রিয়।

কুচী ও অগ্নিদেশের মধ্যে বহু পূর্ব থেকে রাজকীয় অনুষ্ঠানে যাতায়াত আছে। সেই সূত্রে একাধিকবার কুচীতে এসেছেন অগ্নিদেশের রাজা। আসবপানে গভীর আসক্তি তাঁর। মৃগয়াতেও সমান আকর্ষণ।

রাজভগিনীকে একবার দর্শন করে এবং তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ করে তিনি এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে নিজ রাজ্যে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যাবার জন্য বহু চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সেবার রাজভগিনীর সবিনয় অসম্মতি তাঁকে নিরাশ করেছিল।

এবার স্বয়ম্বর সভায় পূর্বাহ্নে এসেই গোপনে সংবাদ সংগ্রহের জন্য চর নিযুক্ত করেছেন। সভাতেই ঘোষণা করা হবে প্রতিযোগিতার বিষয়। সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বীরা সেই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে নিজ নিজ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখবেন। যিনি শ্রেষ্ঠ হবেন তাঁরই কণ্ঠে পড়বে জয়মাল্য। অগ্নিদেশের রাজা তাই আকুল হয়েছেন প্রতিযোগিতার বিষয়টি পূর্বাহ্নে জানার জন্য।

চীন থেকে এসেছেন যুবরাজ। সঙ্গে এনেছেন প্রবল শক্তিমান এক দৈত্য বিশেষকে। যুবরাজের হয়ে সে-ই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। প্রতি-যোগিতায় এ ধরনের অংশগ্রহণে কোন বাধা ছিল না।

পর্বতের সানুদেশে এক সঙ্গীত-শিল্পীর গৃহে কুমারায়ণের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ঐ আত্মভোলা সঙ্গীত-শিল্পীটির তরুণী পত্নী জীবার অন্তরঙ্গ

বান্ধবী। সেই সূত্রে শিল্পীর গৃহে শিল্পীর বাসের ব্যবস্থা।

সঙ্গীতস্রষ্টা হিসেবে কুচীদেশের শিল্পীটির তুলনা ছিল না। প্রতি প্রভাত এবং সন্ধ্যায় শিল্পী গৃহসংলগ্ন উদ্যানে সমবেত পাখিদের সম্মেলক কলরব শুনে সুরসৃষ্টির প্রেরণা পেতেন। তাছাড়া প্রতিটি সুকণ্ঠ পাখি, স্বরক্ষেপণে সুরসৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য তিনি লক্ষ্য করতেন। পর্বতকন্দরে, বালুভূমিতে, বৃক্ষপত্রে বায়ুর শব্দসৃষ্টির পার্থক্য সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন।

একদিন শিল্পী দীর্ঘ সময় অনুপস্থিত দেখে কুমারায়ণ তাঁর খোঁজে পর্বত সানুদেশে গিয়েছিল। সেখানে বহু সন্ধানের পর খোঁজ পাওয়া গেল সুরস্রষ্টার। তিনি একটি প্রপাতের ধারে দাঁড়িয়ে ধারা পতনের ধ্বনি শুনছিলেন আর দুটি ধাতু যন্ত্রের অনুরণন তুলে ধ্বনি মেলাবার চেষ্টা করছিলেন।

কুমারায়ণ যখন অনুরুদ্ধ হয়ে শিল্পীর সামনে বাঁশি বাজিয়ে শোনাত তখন শিল্পী তন্ময় হয়ে তা শুনতেন। নতুন রাগগুলি তুলে নিতেন নিজের সুর সাধনার যন্ত্রে। মাঝে মাঝে বাহবা দিয়ে উঠতেন। কুমারায়ণ যাতে তাঁর গৃহের আতিথ্য ত্যাগ করে চলে না যান সেজন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাতেন। জীবা যে কুমারায়ণের মত এক গুণী শিল্পীকে তাঁর গৃহে কৃপা করে রাখবার সুযোগ করে দিয়েছেন সেজন্যে বার বার কৃতজ্ঞতা জানাতেন জীবার কাছে।

কুমারায়ণের সঙ্গে দেখা করতে আসত জীবা। সে সময় আত্মভোলা শিল্পীটিকে অন্তরালে সরিয়ে নিয়ে যেত তাঁর বুদ্ধিমতী স্ত্রী। জীবা এসে প্রাসাদের খবরাখবর দিত। হূন দস্যুদের কাছ থেকে কিভাবে জীবার দুজন অপহৃত পরিচারিকা রাতের অন্ধকারে আত্মগোপন করে পালিয়ে এসেছিল, কিভাবে তারা পর্বতগুহায় দিন যাপন করে রাতেরবেলা পথ অতিক্রম করত তারই রোমাঞ্চকর কাহিনী একদিন শুনিয়ে গেল জীবা। মেয়েগুলির ওপর কোন অত্যাচার নাকি হূন দস্যুরা করেনি। তারা পারস্যের বণিকদের কাছে ওদের বিক্রয় করে দেবার জন্য নিয়ে যাচ্ছিল।

জীবার সঙ্গে কুমারায়ণের মাঝে মাঝে রাজকুমারীর প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হত।

কুমারায়ণ বলত, স্বয়ম্বরার অনুষ্ঠান তোমার সখী কিভাবে নিয়েছেন জীবা?

গুরু ধর্মমাতির ইচ্ছাকে সখী শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন।

কুমারায়ণ প্রশ্ন তুলত, যদি রাজকন্যার অমনোনীত সেই চীনের যুবরাজ কিম্বা অগ্নিদেশের রাজা বিজয়ী হন তাহলে তাঁদের কিভাবে গ্রহণ করবেন তোমার সখী?

জীবার উত্তর, প্রভু বুদ্ধের করুণার ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস। তিনি মনে করেন যথার্থ যোগ্যতম প্রার্থীই তাঁর জীবনকে ধন্য করার জন্য আসবেন।

স্বয়ম্বর সভার আর মাত্র সপ্তাহকাল বাকী। প্রতিযোগীরা চতুর্দিক থেকে এসে সমবেত হয়েছেন প্রাসাদে। তাঁরা শুভদিনটির জন্য অপেক্ষা করছেন দুরু দুরু বক্ষে।

জীবা এলো কুমারায়ণের সঙ্গে দেখা করতে। মুখখানি তার জলগর্ভ মেঘের মত থমথম করছে।

কুমারায়ণ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে, কি হল জীবা? তোমাকে এমন বিমর্ষ তো কোনোদিন দেখিনি?

জীবা দুটি হাত জড়িয়ে ধরে কুমারায়ণের। চোখ দুটো তার অশ্রুভারে টলমল করছে।

বল জীবা, কি হয়েছে তোমার?

আগে তুমি কথা দাও, আমার একটি কথা রাখবে?

আমি তোমাকে গভীরভাবে বিশ্বাস করি জীবা, তাই কোন প্রশ্ন না করেই কথা দিচ্ছি, তোমার কথা রাখব।

জীবা বলল, আমার সখী বড়ই বিপন্ন হয়ে পড়েছেন কুমার। তোমার সাহায্য ছাড়া তাঁর উদ্ধারের আর কোন উপায় নেই।

কি বিপদ জীবা?

দক্ষিণদেশের একটি মানুষের সঙ্গে এক তীর্থযাত্রায় তাঁর দেখা হয়। পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। বড় বিদ্বান, বড় গুণী সেই মানুষ, কিন্তু একেবারে নিরহঙ্কার।

অধীর কুমারায়ণ বলে, এখন সমস্যা কোথায় জীবা?

সখীর সেই পুরুষপ্রবর এখনও জানেন না যে তাঁকে স্বয়ম্বরের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে রাজভগিনীকে জয় করতে হবে।

এ তোমার সখির অত্যন্ত অবিবেচনার কাজ হয়েছে জীবা। তাঁকে যথাসময়ে সংবাদ দেওয়া উচিত ছিল।

সখীর এখনও ধারণা প্রভু বুদ্ধ তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।

ক্ষুব্ধ কুমারায়ণ বলে, প্রভুর প্রতি বিশ্বাস রাখা ভাল কিন্তু নিষ্ক্রিয় থাকা নির্বোধের কাজ।

একটু থেমে কুমারায়ণ আবার বলে, মহামান্য রাজভগিনীর প্রতি কোনোরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা আমার পক্ষে শোভনও নয়, সমীচীনও নয়। এখন বল জীবা, আমার মত ক্ষুদ্র মানুষ তাঁর কি উপকারে আসতে পারে।

তুমি ক্ষুব্ধ হোয়ো না কুমার, তাহলে কোনো প্রার্থনাই আমি তোমার কাছে করতে পারব না।

তুমি নিশ্চিন্তে বল জীবা, আমি সাধ্যমত সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত।

শোন কুমার, এই প্রতিযোগিতায় একাধিক রাজা, মহারাজা নিজেরা অংশগ্রহণ না করে তাঁদের প্রতিনিধি নিয়োগ করবেন। এই ব্যবস্থা নিয়ম বহির্ভূত নয়। আমার সখীর প্রিয় মানুষটির প্রতিনিধি হয়ে তুমি যদি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ কর তাহলে তিনি তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন।

তাতে আমি প্রস্তুত, কিন্তু যাঁরাই প্রতিনিধি নিয়োগ করবেন তাঁরা তো

সকলেই স্বয়ং উপস্থিত। তোমার বান্ধবীর পুরুষপ্রবরটি এখনও অনুপস্থিত, তাতে চতুর্দিকে গুঞ্জন কিংবা প্রশ্ন উঠতে পারে। সে ক্ষেত্রে পুরো স্বয়ম্বর সভাটাই একটা রণক্ষেত্রে পরিণত হতে পারে।

জীবা ক্ষণকাল চিন্তা করে বলল, এ দিকটা ভেবে দেখিনি কুমার। তোমার অনুমান সত্য হতে পারে। তাহলে এখন উপায়!

জীবা ও কুমারায়ণ চিন্তায় মগ্ন হল!

জীবা সহসা বলে উঠল, একটা উপায় হতে পারে কুমার, অবশ্য যদি তুমি অনুগ্রহ করে রাজী হও।

অনুগ্রহের কথা বলছ কেন জীবা? তোমার সখীর জন্য কিছু করতে পারলে কৃতার্থ হই।

তুমি নিজেই প্রতিযোগিতার প্রার্থী হিসেবে যোগ দাও। তুমি জয়ী হলে রাজকুমারী তোমার অধিকারে আসবে, তখন তাকে তুমি তোমার ইচ্ছামত দান করতে পারবে।

কুমারায়ণ কিছু সময় নীরব থেকে বলল, জীবা, একি খুব সঙ্গত প্রস্তাব হল? আমি রাজকুমারীকে অর্জন করে অন্যকে দান করব, এ কি নিয়মবহির্ভূত কাজ হবে না?

জীবা বলল, আমি তোমাদের ভারতীয় মহাকাব্য মহাভারত পাঠ করেছি। সেখানে ভীষ্মদেব এমনি কাজই করেছিলেন।

কুমারায়ণ সামান্য সময় চিন্তা করে বলল, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক জীবা, এখানে আমার কোনো নিজস্ব মতামত থাকতে পারে না।

স্বয়ম্বরার দিন চতুর্দিক লোকে লোকারণ্য। শিক্ষায় দীক্ষায়, শিল্প-সংস্কৃতি-চর্চায় কুচীর নাম বহুদূরে পরিব্যাপ্ত। সমস্ত প্রাসাদ এবং নগরী শিল্পীদের অক্লান্ত চেষ্টায় পরম শোভাময় হয়ে উঠেছে। কুমারায়ণের বন্ধু শিল্পীটির ওপর ভার পড়েছে সঙ্গীত পরিবেশনের। সম্মেলক ও একক সঙ্গীত তাঁরই পরিচালনায় প্রস্তুত হয়েছে।

নৃত্য প্রদর্শনেরও ব্যবস্থা আছে। সঙ্গীত পরিচালকের পত্নী ও জীবা কুচীর তরুণী কন্যাদের নৃত্য শিক্ষা দিয়ে অনুষ্ঠানের উপযুক্ত করে তৈরি করেছে।

প্রতিটি প্রতিযোগীকে সজ্জিত সভামণ্ডপে নিয়ে আসছে একজন করে তরুণ। শুভ্র পোশাকে তাদের দেবদূতের মত মনে হচ্ছে। তাদের তূনীরে তীর, হাতে ধনু। চন্দ্রাতপের তলায় নির্দিষ্ট আসনে বসান হচ্ছে প্রতিযোগীদের। তরুণরা ধনু আর তূনীরভরা তীর রেখে যাচ্ছে তাদের পাশে।

এবার শুরু হবে প্রতিযোগিতা। সভামণ্ডপের সম্মুখে বিস্তীর্ণ ময়দান। ঘন সবুজ শষ্পে আচ্ছাদিত। তার মাঝে দুটি লোহদণ্ড পরস্পরের থেকে বেশ খানিক ব্যবধানে প্রোথিত। একটি লোহ রজ্জু দুটি দণ্ডের মাঝে টেনে বাঁধা হয়েছে। এখন বিংশতিটি রৌপ্য বলয় ঐ রজ্জুতে নির্দিষ্ট দূরত্বে সংলগ্ন।

এমনভাবে বলয়গুলি রাখা হয়েছে যার মধ্যদিয়ে ফলাযুক্ত একটি তীর চলে যেতে পারে। ঐ বিংশতিটি রৌপ্য বলয়ের একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। রাজভগিনী বিংশতি বর্ষেই পদার্পণ করেছেন।

প্রতিযোগী অশ্বে আরোহন করে প্রান্তর প্রদক্ষিণ করবেন দ্রুত লয়ে। তারপর এক সময় অশ্বকে চিহ্নিত একটি রেখার সামনে এনে দাঁড় করাবার সঙ্গে সঙ্গেই শর নিক্ষেপ করবেন। ঐ শর বলয়গুলির ছিদ্রপথ ভেদ করে চলে যাবে। তীরটি বলয় ভেদ করে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে একটি দোদুল্যমান সূত্রকে ছিন্ন করবে। ঐ সূত্রের প্রান্তে বাঁধা একটি ফল গড়িয়ে পড়বে মাটিতে।

দ্বিতীয় প্রতিযোগিতা অসিযুদ্ধ। পরস্পরের দেহে বিন্দুমাত্র আঘাত না করে অসিযুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। অসি হস্তচ্যুত হলে প্রতিযোগী পরাজিত বলে সাব্যস্ত হবে। শেষ পর্যন্ত যার হাতে অসি থাকবে সেই হবে বিজয়ী।

এরও একটি তাৎপর্য আছে। সংসারে বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে তাদের নিরস্ত্র করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

তৃতীয় এবং শেষ প্রতিযোগিতাটি অভিনব। বুদ্ধের উপদেশ ও বাণী সম্বলিত গ্রন্থ সূত্রপিটকের কয়েকটি পত্র একটি রক্তকষায় বর্ণের রেশমী বস্ত্রে আবৃত করা হয়েছে। প্রাসাদের শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্বেত পারাবতগুলি একটি রজ্জুতে সেই পুঁথিটি বহন করে নিয়ে যাবে শূন্য মার্গে। অশ্বারোহী প্রতিযোগীদের শর নিক্ষেপে ঐ রজ্জুটিকে ছিন্ন করে ধর্মগ্রন্থটিকে মৃত্তিকায় পতনের আগেই লুফে নিতে হবে।

এই প্রতিযোগিতাটির তাৎপর্য, ধর্মকে রক্ষা করতে হবে পতনের হাত থেকে।

প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। প্রথম প্রতিযোগিতায় কেবলমাত্র দুজন বিশটি রৌপ্য বলয় ভেদ করে সূত্রে দোদুল্যমান ফলটিকে মাটিতে ফেলতে সমর্থ হল। একজন অগ্নিদেশের রাজা, অন্যজন কুমারায়ণ। তারা প্রথম প্রতিযোগিতায় সমান শক্তিধর বলে ঘোষিত হল।

দ্বিতীয় প্রতিযোগিতায় চীনের প্রতিনিধি মহাবিক্রমে আঘাত হেনে অগ্নিদেশের রাজার তরবারি হস্তচ্যুত করে দিল। এদিকে দ্বাদশজন অস্ত্র চালনা করতে করতে অবশিষ্ট রইল দুজন মাত্র। কুমারায়ণ আর চীনযুবরাজের প্রতিনিধি।

দীর্ঘক্ষণ অসিযুদ্ধ চলল দুজনের। ক্রীড়াক্ষেত্র ছাড়িয়ে সংলগ্ন পর্বত সানুদেশ পর্যন্ত প্রসারিত হল সে সংগ্রাম। অবশেষে কুমারায়ণের অসি হস্তচ্যুত হয়ে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হল! সঙ্গে সঙ্গে কল্পনাতীত ক্ষিপ্রতায় সে অসি মৃত্তিকা স্পর্শ করার পূর্বেই ধরে নিল কুমারায়ণ। কিন্তু চীনের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠল। বিচারকেরা দ্বিমত পোষণ করলেন।

কুমারায়ণ কিন্তু স্বীকার করে নিল তার পরাজয়। একটি ভীতত্রস্ত ধাবমান

মূষিককে পদাঘাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে যে মুহূর্তকাল মাত্র সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল তারই পূর্ণ সুযোগ নিয়ে চীনের প্রতিনিধি তাকে পরাজিত করল।

এখন শেষ প্রতিযোগিতার প্রতিদ্বন্দ্বী রইল মাত্র তিনজন। কারণ অন্য প্রতিযোগীরা দুটির মধ্যে একটিতেও জয়লাভ করতে না পারায় তৃতীয় প্রতি-যোগিতায় অংশ গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। প্রতিযোগীর সংখ্যা হ্রাসের জন্য পূর্বাহ্নেই ঘোষিত হয়েছিল এই নিয়ম।

এখন প্রাসাদের দিক থেকে তিন ঝাঁক পারাবত পর্যায়ক্রমে উড়ে আসবে রজ্জুতে বাঁধা গ্রন্থ নিয়ে। প্রথমে অগ্নিদেশের রাজা, পরে চীনের প্রতিনিধি, সর্বশেষে কুমারায়ণ অংশগ্রহণ করবে প্রতিযোগিতায়।

অগ্নিদেশের রাজা শরাঘাতে রজ্জু ছিন্ন করলেন। বিদ্যুৎ গতিতে অশ্ব ছুটিয়ে নিয়ে গেলেন, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। কস্ত্রখণ্ডে বাঁধা পুঁথি ভূমি স্পর্শ করল।

চীনের প্রতিনিধি ছিন্ন করলেন রজ্জু, পড়ন্ত পুঁথিটিকে স্পর্শও করলেন কিন্তু ধরে বাখতে পারলেন না।

কুমারায়ণ তন্গত চিত্তে বুদ্ধের নাম স্মরণ করে সমস্ত দেহমন একাগ্র করল। প্রাসাদ-শীর্ষে সখী পরিবৃতা রাজকন্যাও তখন প্রভু বুদ্ধের নাম জপ করছিলেন।

শেষবারের মত গ্রন্থখানি নিয়ে উড়ে আসছে পারাবতের ঝাঁক। অনুত্তেজিত কুমারায়ণ অনায়াসে দক্ষতায় তীর ছুঁড়ল। সঙ্গে সঙ্গে যেন একটি উড়ন্ত অশ্ব উড়ন্ত পারাবতগুলির দিকে এগিয়ে গেল। সূত্রপিটক গ্রন্থখানি পক্ক ফলের মত খসে পড়ল অশ্বে উপবিষ্ট কুমারায়ণের করপুটে।

ভারতীয় পরিব্রাজক এই তরুণের বিস্ময়কর বিজয়ে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে জয়ধ্বনি দিতে লাগল কুচীবাসী নরনারী। প্রাসাদশীর্ষে মুদ্রিত দুটি নয়ন খুলে গেল রাজকন্যার। সহচরীরা উল্লাস প্রকাশ করতে লাগল রাজকন্যাকে ঘিরে।

এরপর প্রসাধিত হয়ে সভামণ্ডপে একে একে প্রতিযোগী এসে আসন গ্রহণ করলেন। জনতা এই বিশিষ্ট অতিথিদের ঘিরে দাঁড়াল। এখন শুরু হবে আসল অনুষ্ঠান। বিজয়ী বীর লাভ করবে রাজকন্যার জয়মাল্য। বেজে উঠল নেপথ্য সঙ্গীতের সুর। তরুণীরা রাজহংসীর মত লীলায়িত ছন্দে জনতার হৃদয়ে তরঙ্গ তুলে প্রবেশ করল সভামণ্ডে। তারা সঙ্গে নিয়ে এলো কুচীর সেরা সুন্দরী ও বিদুষী রাজকন্যাকে।

মহারাজ রজতপুষ্প ভগিনীর হাত ধরে সভা প্রদক্ষিণ করালেন।

ধীর পায়ে রাজকন্যা এগিয়ে এলেন অর্ঘ নিয়ে। আরতি সমাপ্ত করলেন কুমারায়ণের। কুমারায়ণ নতমুখে চেয়ে আছে মৃত্তিকার দিকে। জীবার অনুরোধ রক্ষা করতে পেরেছে, এই পরিতৃপ্তিতে সে আজ পূর্ণ।' এখন রাজ-

কুমারীকে তাঁর প্রার্থিত পুরুষের হাতে তুলে দিতে পারলেই তার এতখানি প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সার্থক হয়ে উঠবে।

হঠাৎ রাজকন্যার হাতের মালা তার কণ্ঠে এসে পড়তেই কুচীবাসী জনতা জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল। অমনি চোখ তুলে তাকাল কুমারায়ণ। রাজকুমারীর স্বর্ণ থালিকায় আর একখানি মালা তারই অপেক্ষায় পড়ে রয়েছে।

এবার রাজকুমারীকে মাল্যদান করতে হবে। থালা থেকে মালাটি তুলে নিয়ে সসঙ্কোচে পরাতে গিয়ে থেমে গেল কুমারায়ণের হাত। স্থির হয়ে রইল আঁখির তারা।

মুখোমুখি দুটি নীল চোখে তখন হাসির ঝিলিক।

অস্ফুট স্বরে কুমারায়ণ বলল, তুমি!

হ্যাঁ, আমি রাজকন্যা জীবা, রাজভগিনীও বটে। থেমে গেলে কেন কুমার, মালা দেবে না আমার গলায়?

একি বিস্ময়! একি অভাবনীয় রোমাঞ্চ! কুমারায়ণ পরম অনুরাগে তার বধূর কণ্ঠে পরিয়ে দিল মালা।

রাত্রে প্রাসাদে পাশাপাশি শুয়ে জীবার হাতখানা বুকের ওপর টেনে নিয়ে কুমার বলল, গোদান থেকে কুচীর পথযাত্রা আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে জীবা। তোমার ছলনাও।

ছলনা কোনো কোনো ক্ষেত্রে মধুর হয় কুমার।

কিন্তু জীবা আমি তো জয়ী নাও হতে পারতাম,—অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করে কুমারায়ণ।

তোমার শক্তির ওপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। প্রতিযোগিতার সময় আমি আঁখি বন্ধ করে প্রভু বুদ্ধকেই শুধু স্মরণ করেছি।

দেখ কি আশ্চর্য, সিদ্ধার্থ গোপাকে ত্যাগ করে পথে নেমে এলেন আর আমি জীবাকে গ্রহণ করে সংসারে প্রবেশ করলাম।

গুরু ধর্মমতি তো তোমাকে বলেই ছিলেন, গৃহীর জীবন তোমাকে যাপন করতেই হবে।

সত্যিই তিনি ত্রিকালদর্শী।

জান কুমার, অগ্নিদেশের রাজা কামকান্তি গত সন্ধ্যাতেই প্রাসাদ ত্যাগ করে গেছেন।

কুমারায়ণ বলল, যাত্রার আগেই আমার সঙ্গে দেখা করে তাঁর রাজ্যে যাবার জন্য আমন্ত্রন জানিয়ে গেছেন। এবং একটি প্রলোভনও দেখিয়েছেন।

কি রকম?

কুচী থেকে উত্তরাপথ ধরে চীন সাম্রাজ্যের তুন হোয়াং-এ যেতে গেলে অগ্নিদেশ থেকেই নাকি যথার্থ মরুভূমির শুরু। ঐ পথে না এগিয়ে দক্ষিণের

রেশম-পথের দিকে চললে মরুভূমির মধ্যে এক বিস্ময়কর হ্রদের সন্ধান পাওয়া যাবে। ঐ হ্রদ কখনো পূর্ণ, কখনো শূন্য। সীতা নদীর জল মরুভূমির ভেতর দিয়ে এসে ঐখানেই পড়ছে। কোনো ঋতুতে জলোচ্ছ্বাসে হ্রদটি ভরে উঠছে, কোনো ঋতুতে বা তাকে শুষে নিচ্ছে মরুভূমির তৃষ্ণা। এখন ঐ লবণ হ্রদের (লবনোর) তীরে একটি ক্ষুদ্র বনভূমি গড়ে উঠেছে। ঐ বনভূমিতে মৃগয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেন অগ্নিদেশের রাজা।

তুমি কি উত্তর দিয়েছ ?

গ্রহণ করেছি তাঁর আমন্ত্রণ। তবে জানিয়েছি, অচিরে সম্ভব না হলেও অদূর ভবিষ্যতে অবশ্যই যাব। মৃগয়ার চেয়ে মরুভূমি অতিক্রমের রোমাঞ্চ আমার কাছে অধিক আকর্ষণীয়।

জীবা কোনো মন্তব্য না করে বলল, কামকান্তি যাত্রার আগে আমার সঙ্গেও দেখা করেছিলেন।

তোমাদের পুরোনো বন্ধু, দেখা করে যাওয়াই স্বাভাবিক।

তিনি আমাকে বহুমূল্য একটি বজ্রমণিখচিত (হীরক) অঙ্গুরীয় দিয়ে গেছেন।

কুমারাযণ কোনো মন্তব্য করল না।

জীবা আবার বলে, অঙ্গুরীয়টি আমার হাতে উপহার হিসেবে তুলে দিয়ে বললেন, বিজয়ী হয়ে এটি অঙ্গুলীতে পরিয়ে মহারাণীর মর্যাদায় রাজ্যে নিয়ে যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু বিধি বাম হল। এখন যা তোমাকে নিবেদন করব বলে এনেছি তা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারব না। তোমার হাতেই তুলে দিয়ে যাচ্ছি, ইচ্ছে হলে গ্রহণ কর না হলে বিলিয়ে দিও পথের কোনো ভিক্ষাজীবীকে।

কুমারায়ণ উঠে বসল সজ্জায়।

নিশ্চয়ই তুমি অঙ্গুরীয়টি সবিনয়ে গ্রহণ করেছ ?

জীবা দ্বিধা জড়িত গলায় বলল, ইচ্ছা থাকলেও প্রত্যাখ্যান করতে পারিনি কুমার।

উপযুক্ত কাজ করেছ জীবা। প্রত্যাখ্যান করলে তুমি তোমার মনুষ্যত্বের অবমাননা করতে। সত্যি, আমি এতগুলি প্রতিযোগীর নিরাশার কারণ হয়েছি বলে নিজেকে অপরাধী মনে করছি।

এতে অপরাধ কিছু নেই কুমার। জগতে আশা থাকলেই নিরাশাও থাকবে। সকলের প্রত্যাশা কোনদিনই একসঙ্গে পূর্ণ হবার নয়।

শোন জীবা, চীনের যুবরাজ আমাকেও একটি উপহার দিয়েছেন।

কৌতূহল জীবার কণ্ঠে, কি উপহার কুমার ?

যে অসির আঘাতে তাঁর প্রতিনিধি আমাকে পরাভূত করেছিলেন, সেই অসি।

জীবা নীরব। কুমারায়ণ বলল, অসিটি আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে চীনের যুবরাজ সহাস্যে বললেন, এটি কাছে থাকলে চরম গর্বের দিনেও কিছুটা বিনীত থাকতে পারবেন।

জীবা বলল, অসি দানের ভেতর প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপটা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ। কোন উত্তর দাওনি যুবরাজের কথার ?

দিয়েছি জীবা, আমার মত করে দিয়েছি। বলেছি, আপনার কথা মনে থাকবে। যদি কখনো গর্ব করার দিন আসে তাহলে তা যেন এমন গর্ব হয় যাতে এ বিশ্বের সকলেরই অংশ থাকে।

জীবা কুমারায়ণকে জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি নইলে এমন উত্তর কে দেবে কুমার।

প্রভাতে চীনের যুবরাজ দেশে ফিরে যাবার সময় কুচীশ্বরকে একটি আলেখ্য উপহার দিয়ে গেলেন। চীনপট্টের ওপর অঙ্কিত বিশাল এক কল্পিত পক্ষযুক্ত সরীসৃপ। নাসা থেকে নির্গত হচ্ছে ভয়ঙ্কর অগ্নি।

বিজ্ঞ মন্ত্রীরা বললেন, শুনেছি এই সরীসৃপ চৈনিকদের কাছে একটি শুভ লক্ষণ। কিন্তু যে প্রতীক চীনের পক্ষে শুভ, তা অন্যের পক্ষে অশুভ হওয়া অসম্ভব নয়। সরীসৃপের নাসারন্ধ্র থেকে নির্গত অগ্নি যে একদিন কুচীরাজ্য পর্যন্ত পেঁাছবে না, তার কি নিশ্চয়তা আছে।

কুচীশ্বর মন্ত্রীদের ব্যাখ্যা শুনে বললেন, আপনাদের ব্যাখ্যা বিজ্ঞজনোচিত। আমার মনে হয় চীনের যুবরাজ অনেক ভেবেচিন্তে দেশ থেকে এই চিত্রটি এনেছিলেন। স্বয়ম্বর সভায় পরাভূত হলে এই চিত্রখানি উপহার দিয়ে যাবেন, এই ছিল তাঁর অভিপ্রায় ! অর্থাৎ কুচীর সঙ্গে চীনের নিরন্তর সংগ্রাম।

মন্ত্রীরা বললেন, আমরা সেই আশঙ্কাই করছি।

এতে আশঙ্কার কিছু নেই। রাজ্য থাকলেই শত্রুর সঙ্গে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রস্তুতিতে ভাটার টান পড়লেই অন্য দিক থেকে প্রবল জোয়ার উঠে আসবে।

ঘণ্টাধ্বনি হয়। পর্বত-সংলগ্ন বিহারে নির্দিষ্ট সময় অন্তর ঘণ্টা বাজাতে থাকে। শত শত ভিক্ষু ঐ ঘণ্টাধ্বনির নির্দেশে প্রায় নিঃশব্দে সমস্ত কাজ সমাধা করে। মহারাজ রজত পুষ্প এই বিপুলায়তন বিহারের সমস্ত ব্যায়ভার বহন করেন।

মহাভিক্ষু রত্নসম্ভব বাহ্লীক থেকে এসে কুচী-বিহারের অধ্যক্ষের আসনে বসেছেন। তিনি গান্ধারের বেশ কয়েকজন শিল্পী ও ভাস্করকে সঙ্গে এনেছেন। তার মধ্যে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ভারতীয় শিল্পীর সংখ্যাই বেশী। তারা এখন কুচীর অন্তর্গত কিজিলের পর্বতগুহায় বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ ও বুদ্ধ-কাহিনীর চিত্রাঙ্কনে ব্যস্ত।

কুমারায়ণকে কুচীশ্বর রাজপুরোহিতের মহাসম্মান দান করেছেন। মহারাজ রজতপুষ্প ভাগিনীগত প্রাণ। নিজের কোন সন্তানাদি না থাকায় সমস্ত স্নেহ ভালবাসা নির্ঝরের মত নিরন্তর ঝরে পড়ছে জীবার ওপর।

জীবা বৌদ্ধ ভিক্ষুণী সঙ্গের প্রাণ। নিত্য যাতায়াত তার ভিক্ষুণী বিহারে।

বৌদ্ধ গ্রন্থের আলোচনা ও অনুবাদে তার সক্রিয় অংশগ্রহণ সুবিদিত। এতখানি পাণ্ডিত্য ও বিচক্ষণতা বৌদ্ধ মহাসঙ্ঘের খুব কম ভিক্ষুরই রয়েছে।

জীবা কুমারায়ণের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করে গভীর আনন্দ পায়। সারাদিনের অধিকাংশ সময়ই তার স্বামীর কাছে বেদ, উপনিষদের পাঠ গ্রহণে কাটে। কুসংস্কার থেকে মুক্ত তাদের মন। তাই সর্বধর্মের সকল শাস্ত্রের প্রতি তাদের অনুরাগ। গ্রহণে, বর্জনে, মঙ্গল চিন্তায় তারা দুটিতে একাত্ম।

খবর আসে গুপ্তচরের মুখে, অগ্নিদেশ চীন বাহিনীর বশ্যতা স্বীকার করে আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়েছে। এখন সৈন্যবাহিনী এগিয়ে আসছে কুচীর পথে।

মহারাজ রজতপুষ্প গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে যান। মন্ত্রী আর সেনাপতিদের সঙ্গে দিবারাত্রি চলে পরামর্শ। স্থির হয় চীন বাহিনীকে প্রবল বিক্রমে প্রতিরোধ করবে কুচীর রাজশক্তি। বশ্যতা স্বীকার করে চীন সাম্রাজ্যের অধীনস্থ সামন্ত রাজার স্বীকৃতি লাভ করার চেয়ে যুদ্ধে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হওয়াও শ্রেয়।

সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে নগরীর দিকে দিকে। ত্রস্ত নগরবাসীরা ভীড় জমায় পথেঘাটে।

কুমারায়ণ আর জীবা রাত্রি দিন ঘুরে ঘুরে তাদের মনে সাহস যোগায়।

শয্যায় শুয়ে ঘুম আসে না কুমারায়ণের চোখে।

জীবাকে ধরে বলে, জান জীবা, এই সয়ম্বরার অনুষ্ঠানটাই যত বিপত্তির কারণ হল।

এ কথা কখনো উচ্চারণ করো না কুমার। দাদা শুনলে গভীর ব্যথা পাবেন। মহারাজ রজতপুষ্প সত্যকে আড়াল করে বিবেককে কখনো বিক্রয় করবেন না।

দেখ জীবা, রাজায় রাজায় আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপিত হলে রাজ্য আক্রান্ত হবার আশঙ্কা থেকে রক্ষা পায়। আমাদের দেশে সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের পিতা মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্ত এই পথই অনুসরণ করেছিলেন। তিনি শক্তিশালী লিচ্ছবী গণরাষ্ট্রের কন্যা কুমার দেবীকে বিবাহ করেছিলেন। তার ফলে তাঁর পুত্র সম্রাট সমুদ্রগুপ্তকে শক্তিশালী রাজাদের দ্বারা আক্রান্ত হতে হয়নি। উপরন্তু শক্তিশালী মাতুল বংশের সঙ্গে যুক্ত থাকায় তিনি প্রভূত ক্ষমতাধর হয়েছেন।

জীবা বলল, বিশাল চীনের বিপুল সৈন্যবাহিনী আমাদের নেই কিন্তু সংগ্রামের দুটি হাতিয়ার আমাদের আছে। একটি, সৈন্যদের অদম্য মনোবল, যা দেশকে ভালবাসা থেকে জন্মেছে, আর অন্যটি, পার্বত্য পরিবেশ, যা যুদ্ধের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল।

কুমারায়ণ বলল, জীবা, ওরা কিজিলের গিরিসঙ্কট পার হয়ে কুচীর সমভূমিতে প্রবেশ করবে। আমি কিজিলেই ওদের প্রতিহত করবার একটা পরিকল্পনা নিয়েছি।

বিস্মিত জীবা বলল, তুমি ! তুমি যুদ্ধের পরিকল্পনা নিয়েছ ? কি বলছ কুমার !

হ্যাঁ জীবা, এতে তোমার সামান্য সাহায্য চাই।

কি পরিকল্পনা তোমার, এবং তাতে আমাকেই বা কি ধরনের সাহায্য দিতে হবে বল ?

তোমার শিক্ষিত পারাবত দু'একটি কাজে লাগবে আমার।

জীবা বলল, তোমার যতগুলি দরকার তাই পাবে তুমি।

এ যুদ্ধে আমার ভূমিকা হবে, রাজপ্রাসাদের পারাবতকুলের রক্ষক ও শিক্ষাদাতা।

এরপর জীবা নিবিষ্ট হয়ে শুনল কুমারায়ণের পরিকল্পনা।

সব শুনে বলল, তোমার জীবন-সংশয় হতে পারে কুমার।

যুদ্ধে সবারই যখন জীবন-সংশয় তখন তার থেকে নিজেকে মুক্ত রাখি কি করে বল ? আমি কুচীবাসীর একান্ত আপনার জন হতে চাই।

তুমি তো তাই।

না জীবা, শিল্পীর বাড়ি থেকে আজ সন্ধ্যায় ফেরার সময় নিজের কানে নাগরিকদের সমালোচনা শুনেছি।

কি রকম ?

স্বয়ম্বরসভায় চীন-যুবরাজের পরাজয়কেই তারা এ যুদ্ধের কারণ বলে অনুমান করছে। আর পরোক্ষভাবে এ জন্য আমাকেও দায়ী করছে।

জীবা ক্ষণকাল স্থির থেকে বলল, প্রভুর দয়ায় ওরা যেন একদিন নিজেদের ভুল বুঝতে পারে।

কিজিলের পাহাড় কেটে গুহামন্দির তৈরিব কাজ চলছে। ভারতীয় স্থপতি ও ভাস্করদের নির্দেশে শত শত শ্রমিক পাহাড়ের দুই প্রান্ত বিদীর্ণ করে গুহা তৈরির কাজে ব্যস্ত। মৃত্তিকার অভ্যন্তরে মুষিকের শতমুখ গর্তের মত তারা পাহাড়ের অভ্যন্তরে নির্মাণ করে চলেছে সুড়ঙ্গ পথ। ভারতভূমির সন্তান, প্রধান স্থপতি হিরণ্যগর্ভ। তারই নির্দেশে প্রস্তর বিদীর্ণ করে চলেছে সুড়ঙ্গ নির্মাণের কাজ।

কুমারায়ণের পরিচয় পেয়ে স্থপতি হিরণ্যগর্ভ যেন আপনজন লাভের আনন্দ অনুভব করছে। সুদূর পাটলিপুত্র থেকে স্থপতি প্রথম যৌবনে এসেছিল গান্ধারে। সেখানে কিছুকাল শিক্ষালাভ করে কুভা নদীর উপত্যকা বেয়ে এসে পৌঁছেছিল নগরহারে। সেখান থেকে সার্থবাহের পায়ে চলা পথে আরও এগিয়ে এসে পৌঁছেছিল কপিশায়। সে সময় গান্ধারের চেয়ে কপিশা ছিল আরও সমৃদ্ধশালী। ভারতবর্ষ থেকে উত্তরবাহিনী প্রধান পথ কপিশা হয়ে বাহ্লীক ও অন্যান্য দেশে পৌঁছেছে। হিরণ্যগর্ভ কপিশা থেকে দুর্গম কুশান উপত্যকা পেরিয়ে একসময় বাহ্লীকে এসে পৌঁছায়। বাহ্লীকেই কেটে যায় তার জীবনের

শ্রেষ্ঠ দিনগুলি। সেখানে স্থপতিবিদ্যায় সে লাভ করে চরম উৎকর্ষ। কর্মের মধ্যে নিজেকে নিবেদন করে সংসারজীবন যাপনের কথা সে একেবারেই ভুলে যায়। প্রৌঢ়ত্বের প্রারম্ভে হিরণ্যগর্ভ বাহ্লীকের মহাশ্রমণ রত্নসম্ভবের কাছে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। তারপর কুচীর বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ হয়ে আসার সময় যে স্থপতি ও ভাস্করের দলটিকে রত্নসম্ভব সঙ্গে এনেছিলেন তাদের সঙ্গেই এসেছিল হিরণ্যগর্ভ। এখন নিজের কৃতিত্বে সে শ্রেষ্ঠ স্থপতির আসন লাভ করেছে।

অসমবয়সী কুমারায়ণকে পুত্রের মত স্নেহের চোখে দেখে হিরণ্যগর্ভ, আবার বন্ধুর মত তার সঙ্গে আলাপ আলোচনায় মত্ত হয়।

দুদিন আগে একটি বিষয় নিয়ে দুজনের ভেতর গূঢ় এক পরামর্শ হয়ে গেছে। কিজিলের পর্বত বিদীর্ণ করা সুড়ঙ্গ পথগুলির প্রত্যেকটি ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করেছে দুজনে। তারপর পরস্পরকে শুভকামনা জানিয়ে বিদায় নিয়েছে তারা।

কিজিলের কাছাকাছি এসে থেমে দাঁড়াল চীনের পুরোবাহিনী।

অদূরে, যেখানে বালু প্রান্তর শুরু হয়েছে সেখানে দাঁড়িয়ে তিনটি সাধারণ মানুষ কি নিয়ে যেন বিবাদ শুরু করেছে।

অশ্বারোহী চীনা সেনাপতি ইঙ্গিতে ওদের কাছে ডাকলেন। আঞ্চলিক অধিবাসীদের কাছ থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করাই তাঁর উদ্দেশ্য।

ওরা কাছে গিয়ে যথারীতি অভিবাদন জানাল। ওদের দেখে মনে হল ওরা ভয়ে কাঁপছে।

সেনাপতি প্রশ্ন করলেন, কি করছ তোমরা এখানে? কি তোমাদের পরিচয়?

দুজন পরস্পরের মুখের দিকে নির্বোধের মত তাকাতে লাগল। বোঝা গেল তারা সেনাপতির ভাষা বোঝেনি।

তৃতীয়জন চীনে ভাষাতেই উত্তর করল, মহাশয়, লৌহ খনিত্র হাতে যে ব্যক্তিটিকে আপনি দেখেছেন উনি কিজিলের পাহাড়ে সুড়ঙ্গ নির্মাণের কাজে নিযুক্ত।

সেনাপতির প্রশ্ন, পর্বতে সুড়ঙ্গ নির্মাণ কেন?

বৌদ্ধ গুহা-মন্দির তৈরির কাজ চলেছে। রাজপ্রাসাদ থেকে গুপ্ত একটি সুড়ঙ্গ পথ কিজিলের বৌদ্ধ গুহা-মন্দির পর্যন্ত নির্মাণ করা হয়েছে। নতুন সঙ্ঘারামে উৎসব হলে যাতে প্রাসাদের রাণীমহল থেকে রাণীরা সহজে আসতে পারেন।

সঙ্ঘারাম কি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?

সব কাজই শেষ। সামনের পূর্ণিমা তিথিতে নব সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠার কথা, কিন্তু যুদ্ধের জন্য সব অনুষ্ঠানই বন্ধ হয়ে গেছে।

তুমি কে ? তুমি এতসব কথা জানলে কি করে ?

মহামান্য বলাধ্যক্ষ, আমি ভারতীয় পক্ষীতত্ত্ববিদ, কুচীর রাজ প্রাসাদে রাজকীয় পারাবতদের শিক্ষাদানের কাজ নিয়ে এসেছি। ঐ সুড়ঙ্গ বন্দীটিও ভারতীয়। আমার পূর্ব পরিচিত।

আর ঐ তৃতীয়জন, তোমাদের ভেতর সবচেয়ে যে বয়োবৃদ্ধ ? যার হাতে বাজপাখি রয়েছে ?

ওর সঙ্গে আমাদের কোনো পরিচয় নেই মহাশয়। শিকারী বাজ নিয়ে পাখি ধরাই ওর কাজ। আজ পক্ষকাল হল ভুরুক চোক্কুক, গোদানের রাজাদের কাছে প্রাসাদ থেকে যুদ্ধের খবর জানিয়ে যত পারাবত পাঠান হয়েছে তারা আর ফিরে আসেনি। তাই মহারাজ ক্ষিপ্ত হয়ে আমার বহিষ্কারের আদেশ দিয়েছেন। প্রাসাদের সম্মুখের সিংহদ্বারগুলি যুদ্ধের কারণে বন্ধ থাকায় আমি গুপ্ত সুড়ঙ্গ-পথে কিজিলে চলে এসেছি। সুড়ঙ্গের মুখে আমার পরিচিত বন্ধুটির সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। তিনি তখন একাই সুড়ঙ্গের দ্বার রক্ষা করছিলেন। কারণ আর সকলে যুদ্ধের ভয়ে পুরাতন সংঘারামে ভিক্ষুদের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

সেনাপতি প্রশ্ন করলেন, পারাবত ফিরে এলো না বলে তোমাকে বিতাড়িত করা হল ?

হ্যাঁ মহামান্য বলাধ্যক্ষ। আমরা ভারতীয়, কুচীবাসীর কাছে বিদেশী। মহারাজের ধারণা হয়েছে চীনের সঙ্গে ভারতীয়দের ধর্ম, বাণিজ্য, সর্বদিক দিয়েই সংযোগ বেশি, তাই বুঝি আমি ইচ্ছা করেই পারাবতদের ভুল পথে প্রেরণ করেছি।

হা হা করে হেসে উঠলেন সেনাপতিপ্রবর।

মহাশয়, কুচীশ্বরের ধারণা যে সত্য নয় তা আমরা দু'বন্ধু প্রমাণ করে দিতে পারব।

কি রকম ?

এই বৃদ্ধ পক্ষী শিকারীই সব অঘটনের মূল।

পরিষ্কার করে বল।

আমরা দুই ভারতীয় মনের দুঃখে এখানে পরিভ্রমণ করছিলাম হঠাৎ দেখলাম রাজপ্রাসাদ থেকে সংবাদবাহী দুটি পারাবত উড়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে ঐ বৃদ্ধের হাতের বাজটি উড়ে গিযে একটি পারাবত ধরে আনল। অন্যটি ততক্ষণে গোদানের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। এখন আমরা ওকে প্রশ্ন করে জানতে পেরেছি, ভুরুকের কাছাকাছি এক মরূদ্যানে ও কদিন ধরেই পাখি ধরার জন্য আস্তানা গেড়েছিল। ঐ মরূদ্যান বরাবর পথ গেছে গোদানের দিকে। আমরা প্রাসাদ থেকে যত পারাবত ভুরুক, চোক্কুক অথবা গোদানের দিকে উড়িয়েছি, তাদের প্রায় সবকটিকে যাবার অথবা ফিরে আসার পথে ঐ লোকটা বাজ দিয়ে ধরে নিয়েছে।

সেনাপতি সাগ্রহে বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন, পারাবতের গলায় বাঁধা কোন বস্তু তুমি পেয়েছ কি? পেয়ে থাকলে দিয়ে দাও।

লোকটা সেনাপতির ভাষা বুঝল না। তখন তৃতীয় লোকটি আঞ্চলিক ভাষায় তাকে সেনাপতির কথা বুঝিয়ে বলল। বৃদ্ধ দু'চার কথা বলার পর তার ঝুলি থেকে একটি রৌপ্যনির্মিত কবচ বের করে দেখাল।

তখন দোভাষী সেনাপতিকে বুঝিয়ে বলল, পাখি ধরাই লোকটির কাজ। কবচের ভেতর কি আছে না আছে তা দেখার কাজ ওর নয়। ও কবচগুলো মরুদ্যানের আশেপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। কেবল কিছু আগে যে পাখিটি ধরেছে, তার গলায় একটি রৌপ্য কবচ ছিল, তাই সেটি রেখে দিয়েছে। দরকার হলে নিতে পারেন মহাশয়।

সেনাপতি কবচটি হাতে নিয়ে তার ভেতর কিছু দেখতে না পেয়ে বললেন, কই কিছু তো দেখছি না।

দোভাষী লোকটি বলল, ধাতুর গায়েই তো সংক্ষেপে সব কথা লেখা আছে মহাশয়।

পড়ে শোনাও কি লেখা আছে।

প্রাসাদের পক্ষী বিশারদ উল্টেপাল্টে দেখে পড়তে লাগল। অবশ্য চীনে ভাষায় রূপান্তরিত করে।

মহামহিম মহারাজ, গোদান, সমীপেষু—

গোদানেশ্বর, মহা বিপদ আসন্ন। চীন রাক্ষস এগিয়ে আসছে কুচীর দিকে। আপনারা চোক্কুক, ভুরুক বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়ে ওদের আক্রমণ করুন পেছনের দিক থেকে। আমরা প্রচুর খাদ্য আর সৈন্য নিয়ে প্রাসাদ ও নগর রক্ষার ব্যবস্থা করেছি। দুর্ভেদ্য প্রাসাদে প্রবেশের একটিও ছিদ্রপথ রাখিনি। মাসাবধি ওদের যুদ্ধে নিযুক্ত করে রাখতে পারব বলে মনে করি। তার ভেতর ঐ হীনবল চীনাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিন। বিনীত ঃ কুচীশ্বর।

চীনের সেনাপতি বহুক্ষণ আপন মনে কিছু চিন্তা করলেন। পরে অধীনস্থ সৈন্য পরিচালকের সঙ্গে অনুচ্চে পত্র সম্বন্ধে পরামর্শ করলেন। শেষে আদেশ দিলেন, অগ্রসর না হয়ে এইখানেই শিবির স্থাপন কর। আর এই তিন ব্যক্তিকে শিবিরের মধ্যে রেখে উপযুক্ত খাদ্য পানীয়ের ব্যবস্থা করে দাও।

রাত্রে দোভাষী লোকটির সঙ্গে নানা আলোচনা ও পরামর্শের পর স্থির হল, চীনা বাহিনীর প্রধান অংশটি রাত্রেই সুড়ঙ্গ পথে একেবারে প্রাসাদে গিয়ে পৌঁছাবে। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দলটি বৃদ্ধ পক্ষী-শিকারীর সঙ্গে যাবে মরুদ্যানে। তারা সেখানে শিবির ফেলে কুচীশ্বরের মিত্র বাহিনীর আগমনের প্রতীক্ষা করবে।

সুড়ঙ্গ নির্মাতা আর প্রাসাদের পক্ষী-বিশারদকে নিয়ে বিশাল এক বাহিনী নিঃশব্দে স্বল্প চন্দ্রালোকে পাহাড়ে আরোহণ করতে লাগল।

গুহামুখে পৌঁছে প্রথমে সেনাপতি সুড়ঙ্গ নির্মাতার সঙ্গে দুটি সৈন্যকে

পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য পাঠালেন।

মশাল জেবলে আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গ পথে তারা বহুদূর অগ্রসর হল। এরপর সুড়ঙ্গ সংলগ্ন অতি ক্ষুদ্র গবাক্ষ পথে চেয়ে দেখল কুচীর রাজপ্রাসাদ অতি সন্নিকটে। ফিরে এল সৈন্য দুটি সুড়ঙ্গবিদকে সঙ্গে নিয়ে।

এরপর স্বয়ং সেনাপতি তার বাহিনী নিয়ে নির্ভয়ে অগ্রসর হল।

অদ্ভূত নির্মাণ কৌশল এই সুড়ঙ্গের। দুর্বল চুনা পাথরের স্তর যেদিক দিয়ে গেছে সেই স্তরটিকে চিহ্নিত করেছে সুড়ঙ্গবিদ। তারপর সেই স্তরটি ধীরে ধীরে কাটতে কাটতে তৈরি করেছে দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পথ। সুড়ঙ্গের ওপরে মাঝে মাঝে তৈরি করা হয়েছে বায়ু চলাচলের জন্য গোল আকৃতি বিশিষ্ট ঝর্ঝরী।

মশাল জেবলে চলেছে মশালধারী, তার সামনে পেছনে অস্ত্রধারী চীনা বাহিনী। পক্ষীবিশারদ ও সুড়ঙ্গবিদকে সঙ্গে নিয়ে সামনে চলেছেন সেনাপতি। একটি বিষাক্ত সর্প তার সমস্ত দেহটাকে ঢুকিয়ে নিচ্ছে গর্তের মধ্যে।

প্রাসাদ-প্রাকারে সংলগ্ন সুড়ঙ্গের বহির্গমন মুখ। একটি বিশাল প্রস্তর নির্মিত কপাট ফেলা আছে সেখানে। প্রাসাদের দিকে শিকলে বাঁধা প্রস্তরচক্র ঘুরিয়ে কপাটটিকে সরাতে হয়।

পক্ষীবিশারদ সেনাপতিকে বলল, দুটি শক্তিশালী সৈনিক আমাদের দুজনের সঙ্গে দিন। আমরা পাশের সোপান বেয়ে মাথার ওপর ক্ষুদ্র নির্গমন পথে বেরিয়ে প্রস্তর চক্র ঘুরিয়ে দ্বার উন্মুক্ত করে দেব।

সেনাপতির নির্দেশে দুটি সমর্থ সৈনিক বেরিয়ে গেল সুড়ঙ্গের ছিদ্র পথে দুজন পথ প্রদর্শকের সঙ্গে। সহসা প্রবল আঘাতে দুটি সৈনিক ছিটকে পড়ে গেল গভীর গিরিখাদে। ওপরের খোলা বৃত্তাকার বহির্গমন পথটি পাথরের দৃঢ় ঢাকনায় বন্ধ হয়ে গেল।

পক্ষীবিশারদরূপী কুমারায়ণ আর সুড়ঙ্গবিদ হিরণ্যগর্ভ তখন পাহাড়ের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে প্রবেশ মুখের দিকে। এক সময় নির্দিষ্ট স্থানে এসে পৌঁছল তারা। পাথরের স্তূপের আড়ালে রক্ষিত ধনুটি তুলে নিয়ে কুমারায়ণ শরযোজন করে গুহা মুখে চারজন রক্ষীকে বধ করল। তারপর অতি ক্ষিপ্রতায় প্রস্তরচক্র ঘুরিয়ে সৈন্যদের প্রবেশ পথের দ্বার রুদ্ধ করে দিল।

প্রাসাদে যখন দুজনে এসে পৌঁছল তখন ক্লান্তি ও উত্তেজনায় কম্পিত হচ্ছে শরীর। মহারাজ রজতপুষ্প বলাধ্যক্ষদের নিয়ে আলোচনায় বসেছিলেন। কুমারায়ণের মুখে সকল কথা শুনে উপস্থিত সকলেই বিস্মিত, স্তম্ভিত, হতবাক।

কুমারায়ণ বলল, মহারাজ চীনাদের ঐ ক্ষুদ্র দলটিও উপেক্ষণীয় নয়। এই মুহূর্তে ভুরুকের মরুদ্যানের দিকে সৈন্য প্রেরণ করুন। শত্রুকে আকস্মিক আঘাত হেনে বিপর্যস্ত করে দেওয়াই বিধি।

সঙ্গে সঙ্গে সিংহদ্বার খুলে গেল। অশ্বারোহীরা বেরিয়ে গেল নগর পথে। নগরের কটক থেকে সৈন্যরা তাদের পশ্চাতে সারিবদ্ধ ভাবে অগ্রসর হল।

সবে চীনা সৈন্যরা শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে মরূদ্যানে এসে শিবির সংস্থাপনে ব্যস্ত এমন সময় আক্রান্ত হল কুচীর পরাক্রান্ত সৈন্যদের দ্বারা। প্রতিআক্রমণ করার অবকাশই পেল না তারা। কিছু হল নিহত, অধিকাংশই হল বন্দী।

এদিকে দুদিন সুড়ঙ্গের অভ্যন্তরে বন্দী থেকে যখন চীনা সৈন্যরা ক্ষুধা, তৃষ্ণা আর প্রাণভয়ে মৃতপ্রায় তখন সুড়ঙ্গের উপরিস্থ ছিদ্রপথ উন্মুক্ত করে দেওয়া হল। এক একটি সৈনিক বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাদের অস্ত্রহীন করে বন্দী করা হল। পরে এসব শক্তিহীন সৈন্যদের অগ্নিদেশের প্রান্ত পর্যন্ত বিতাড়িত করে দিয়ে এল কুচীর সৈন্যদল। এমন অসম্মানজনক আত্মসমর্পণ চীনকে বোধকরি আর কখনো বরণ করতে হয়নি।

ছয়

জীবা, সত্যি ?

লক্ষণ তাই। আমার বৃদ্ধা ধাত্রীমা এ বিষয়ে নিশ্চিত।

অন্ধকার শয্যায় জীবার হাতখানা নিজের বুকের ওপর চেপে ধরে কুমারায়ণ বলে, প্রতিদিন তথাগতের চরণে প্রার্থনা জানাও জীবা, তোমার অনাগত সন্তান যেন তাঁর শরণ লাভ করে।

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল জীবা।

এমন আনন্দ সংবাদকে অশ্রুজলে ভাসিয়ে দিচ্ছ ?

জীবা কতক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না। একসময় কুমারায়ণের হাতখানা শক্ত করে চেপে ধরে বলল, আমি চেয়েছিলাম, পুত্রসন্তান কোলে এলে তোমার মত যেন বীর হয়।

আর কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তোমার মত যেন বুদ্ধের উপাসিকা হয়, তাই না ?

আমি আর কিছু চাইব না। প্রভুর ইচ্ছাই হবে আমার ইচ্ছা।

যদি পুত্র হয় তার নাম তো আগেই আমরা স্থির করে রেখেছি। দেখ জীবা, তোমার সন্তান তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ করবে। সে তার পিতার চেয়েও অনেক বড় বীর হবে। এ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বীরেরা তার সম্মুখে অস্ত্র সমর্পণ করে গ্লানিমুক্ত হবে। বিজয়ী হয়ে তোমার পুত্র কুমারজীব একদিন মানুষের হৃদয়-সিংহাসনে সম্রাট হয়ে বসবে।

কুমার, তেমন সন্তান-সৌভাগ্য কি আমার হবে। জীবা কি চিরকুমার চিরজীবী পুত্রের জননী হতে পারবে ?

তাইতো বলছিলাম, প্রভুর কাছে প্রতিদিন প্রার্থনা জানাও। গভীর আন্তরিক প্রার্থনা কখনো নিষ্ফল হয় না।

কুমারায়ণের মুখ দিয়ে সে রাতে যেন প্রভু বুদ্ধই এই সত্য উচ্চারণ করেছিলেন।

যথাকালে ভূমিষ্ঠ হল কুমারজীব। পিতার মত অবয়ব, মাতার মত বর্ণ। শৈশব থেকেই তার চোখে মুখে ফুটে উঠত আশ্চর্য সব জিজ্ঞাসা। তার সব জিজ্ঞাসার উত্তর ছিল বিদুষী মায়ের মুখে।

পঞ্চমবর্ষে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কুমারজীবের শিক্ষারম্ভ হল। কিন্তু আনুষ্ঠানিক বিদ্যারম্ভের পূর্বেই সে বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিল। বহু বৈদিক সূক্ত তখন তার কণ্ঠস্থ। কুচীয়, সংস্কৃত ও চৈনিক, এই ত্রিভাষা শিক্ষার কাজ তার অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিল।

অসীম প্রতিভাধর এই শিশুর জন্য নিত্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা জানায় জীবা। পুত্রের জন্য কোন গর্ববোধ নেই তার মনে। সে জানে জননীর অহঙ্কার অনেক সময় সন্তানের পতনের কারণ হয়। বিনয় আর নম্রতা যে শ্রেষ্ঠ প্রাথমিক শিক্ষা, সেই সত্যে অবিচলিত থেকে সে শিশুপুত্রকে শিক্ষা দিয়ে যায়।

মহারাজ রজতপুষ্প কেবল ভাগিনেয়ের অলৌকিক প্রতিভার কথা শত মুখে প্রকাশ করে বেড়ান। জীবা অনুযোগ জানিয়ে বলে, দাদা অতিরিক্ত বায়ুর তাড়নায় অগ্নি যে কেবল প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে তা নয়, নির্বাপিত হবার সম্ভাবনাও থাকে।

মহারাজা ভগিনীর কথায় কর্ণপাত না করে বলেন, আমার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী যে একজন অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ সেটা বহু পূর্ব থেকেই প্রত্যেকের গোচরে আনা ভাল। আমার অবর্তমানে জ্ঞাতিরা হিংসাকাতর হয়ে উঠবে। তাদের মুখ পূর্বাহ্নেই বন্ধ করা চাই। এই দেখ না, চীনের আক্রমণের সময় স্বয়ম্বরসভার কথা তুলে আমার জ্ঞাতিরাই কুমারায়ণের বিরুদ্ধে সারা নগরে অপপ্রচার করে বেড়াল। তারপর নাগরিকেরা যেই তার কৃতিত্বের পরিচয় পেল অমনি জ্ঞাতিদের মুখ বন্ধ হল। এখন কুমারায়ণের নামে সারা নগরী পাগল।

একটু থেমে গলা নামিয়ে অভিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞের মত বললেন, জীবা, এই উপযুক্ত সময়, পিতার সঙ্গে সঙ্গে পুত্রের নামটা গাঁথা হয়ে যাক নাগরিকদের মনে।

অবুঝ অগ্রজকে বোঝাতে পারে না জীবা যে পৃথিবীতে সাম্রাজ্যের অধিকারী হওয়াই পরম ধন লাভ নয়, তার চেয়ে অনেক বড় সম্পদ অপেক্ষা করে আছে মানুষের জন্য। যে অর্জন করতে পারে সে ধন সেই হয় রাজরাজেশ্বর। পৃথিবীর সম্রাট তাঁর চরণতলেই মুকুট নামিয়ে রাখেন।

জীবা আঘাত দিতে পারে না স্নেহপ্রবণ অগ্রজকে। সে মহারাজ রজত-পুষ্পের উচ্ছ্বাসের মাঝখানে নীরব হয়ে থাকে।

অগ্নিদেশের রাজা কামকান্তির কাছ থেকে বিশেষ দূতের মাধ্যমে পত্র এলো।

পত্রটি কুমারায়ণের উদ্দেশ্যে রচিত।

প্রিয় সখা,

চৈনিক আক্রমণ প্রতিরোধে এবং তাদের বিশাল বাহিনীকে পর্যুদস্ত করার ব্যাপারে আপনি যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা কেবল কুচী নয়, অগ্নিদেশ-বাসীরাও গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে।

আজ ষষ্ঠ বর্ষ অতিক্রান্ত হল, সেই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ হয়েছিল স্বয়ম্বর-সভায়। আমি দেশে ফিরে আসার আগে লবণহ্রদে আপনাকে মৃগয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছিলাম। আমি ভুলিনি আমার প্রতিশ্রুতি। এখন রাজ্য উপদ্রবমুক্ত। মৃগয়া যাত্রার জন্য আমি প্রস্তুত। আপনি কি বন্ধু এ মৃগয়ায় আমার সহগামী হবেন? যদি ইচ্ছা থাকে তাহলে মহারাজ রজতপুষ্পের সঙ্গে পরামর্শ করে দূতের সঙ্গেই চলে আসুন।

আপনার চির বিশ্বস্ত সুহৃদ কামকান্তি।

ভ্রাম্যমানের রক্ত কুমারায়ণের দেহে প্রবাহিত। পত্র পাওয়া মাত্র সে মরু-যাত্রার জন্য উৎসুক হয়ে উঠল। মৃগয়া তার কাছে উপলক্ষ্য মাত্র, আসল লক্ষ্য মরুকান্তারে ভ্রমণ।

মহারাজ রজতপুষ্প বললেন, মৃগয়ার আহ্বান এলে তাকে গ্রহণ করাই বীরের ধর্ম। তুমি বীর, নিঃসন্দেহে এ আহ্বান তোমার গ্রহণ করা উচিত। তবে কামকান্তি বিশুদ্ধ মনের অধিকারী নয়, তাই সতত সাবধান হয়ে থাকাই বাঞ্ছনীয়।

রাত্রে জীবার সঙ্গে সাক্ষাৎ, অনুমতি দাও জীবা।

মন বড় বিচলিত কুমার।

কেন জীবা?

গোদানের মহারাজ অমিত্রবিজয়ের কাছ থেকে আহ্বান এলে নির্দ্বিধায় তোমাকে অনুমতি দিতাম। কিন্তু কামকান্তির সমস্ত মন কামনায় পূর্ণ সে আহত বিষধর, তাকে বিশ্বাস নেই।

জীবা, মিথ্যা তোমার শঙ্কা। স্বয়ম্বরের এতকাল পরেও কারও মনে ঈর্ষা থাকতে পারে, এ আমি বিশ্বাস করি না। আর তাছাড়া কামকান্তি কুচী রাজের কাছে কৃতজ্ঞ। চীনা শত্রুকে অগ্নিদেশ থেকে কুচীশ্বরই বিতাড়িত করেছেন।

তুমি যাত্রার জন্যে মনে মনে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছ, তোমাকে আমি বাধা দেব না। সাবধানে থেকো, প্রভুকে স্মরণ কর।

মনে মনে হাসল কুমারায়ণ, মৃগয়া যাত্রার পূর্বে আর যাকে স্মরণ করা যাক না কেন অহিংসার পূজারী প্রভু বুদ্ধকে নিশ্চয়ই নয়। মুখে বলল, অবশ্যই সাবধানে থাকব। তবে এই সত্যটি স্থির জানবে, মানুষ ভবিতব্যের অধীন। আমার যদি কোনো বিপদ আসে তাহলে তা তোমার দু-বাহুর আকুল বন্ধনের মাঝে বাঁধা থেকেও আসতে পারে।

মরুচর একটি অশ্বে আরোহণ করে কুমারায়ণ অগ্নিদেশের উদ্দেশে যাত্রা করল। যাবার আগে কুমারজীবকে বুকে তুলে নিয়ে অস্ফুটে বলল, জননীর চরণ শরণ করে বিশ্ববিজয়ী হও পুত্র।

জীবা যাত্রা কালে একটি শিক্ষিত পারাবত সঙ্গে দিয়ে বলল, তোমার তূণীরের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। অগ্নিদেশে গিয়ে ওকে সেই গোপন প্রকোষ্ঠে রেখে দিও। যে কোনো বিপদে সংবাদ পাঠিও ওর মাধ্যমে। আশাকরি তার প্রয়োজন হবে না। ও তোমার সঙ্গেই ফিরে আসবে।

কুমারায়ণ অগ্নিদেশে উপস্থিত হলে তাকে মহাসমাদরে গ্রহণ করলেন কামকান্তি। কিন্তু মৃগয়াযাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ থাকায় কুমারায়ণের অনুমতি নিয়ে পরদিনই লবণহ্রদের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। কয়েকজন অভিজ্ঞ পরিচারক সঙ্গে চলল প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী মরুচর অশ্বের পিঠে বোঝাই করে নিয়ে।

গোবিমরুর প্রান্ত ঘেঁষে শুরু হল যাত্রা। এ এক ভয়ঙ্কর সুন্দর পথ। ধূ ধূ মরু, প্রাণকে নিশ্চিহ্ন করে শুষে লেহন করে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে দিগন্ত লক্ষ্য করে। জ্যোৎস্নারাতে অপার রহস্যময় মনে হয় ঢেউতোলা মরু সমুদ্রকে। প্রদীপ্ত নক্ষত্রের চোখ মেলে রাত্রির আকাশ চেয়ে চেয়ে তার রহস্যের সন্ধান করে বেড়ায়। এ সময় শীতল পরিবেশের সুযোগে সমস্ত দলটি হেঁটে চলে। নক্ষত্রবিদ অভিজ্ঞ পরিচালক আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। রাত্রে কিছু সময় বিশ্রাম। প্রভাতে রৌদ্রের কমনীয় আলোয় আবার যাত্রা। কিন্তু তা বেশি সময়ের জন্য নয়। সূর্য ক্রমে রুদ্র হয়ে ওঠে। আকাশ থেকে ঝলকে ঝলকে বর্ষিত হয় অগ্নি। অমনি শুরু হয়ে যায় মরু-নর্তকীদের নৃত্য। আগুনের উত্তরীয় উড়িয়ে সোনালী ঘাঘরা ঘুরিয়ে তারা বিশাল মরুপ্রান্তরে ঘূর্ণি-নৃত্য নেচে চলে।

এ সময় পুরো দলটি শিবিরের মধ্যে অবস্থান করে।

একদিন ওরা পথ চলতে চলতে মরু-ঝড়ের মুখোমুখি পড়ে যায় ; নিজেদের আবৃত করে পড়ে থাকে বালির প্রান্তরে। ঝড় সরে গেলে উঠে দাঁড়ায় স্তূপীকৃত বালুকা সরিয়ে। কিন্তু বিপত্তি দেখা দেয় পুরো দলটির যাত্রা পথে। অবলুপ্ত হয়ে গেছে পদচিহ্ন। সামনে সৃষ্টি হয়েছে অগণিত ক্ষুদ্র বৃহৎ বালির তরঙ্গ।

প্রায় মধ্য গগনে সূর্য। প্রাণঘাতী রশ্মির শরে বিদ্ধ হচ্ছে চরাচর। শিবির সংস্থাপন করে বিশ্রামের আয়োজন করা হল। সন্ধ্যায় চাঁদের উদয়। পথপ্রদর্শক শিবির থেকে বেরিয়ে পথের সন্ধান করতে লাগল। প্রায় মধ্যরাত্রে তাকে ফিরে আসতে দেখা গেল। অত্যন্ত উৎফুল্ল। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পশুকঙ্কাল আর মনুষ্য করোটীর চিহ্ন খুঁজে পেয়েছে সে। এই মরুভূমির স্থানে স্থানে কালে- কালে হতভাগ্য পথিকেরা মরুঝড়ে অথবা জলাভাবে ভয়ঙ্কর মৃত্যুর কবলে পড়েছে। তারাই তাদের বিক্ষিপ্ত দেহাবশেষে রেখে দিয়েছে দিগভ্রষ্ট পথিকের জন্য দিকচিহ্ন।

আবার পথযাত্রা। শেষ রাত্রে ক্লান্ত অবসন্ন যাত্রীরা শিবির রচনা করে নিদ্রা যায়। কুমারায়ণের ঘুম আসে না। এই ত্রিংশৎ বৎসর জীবনকালের মধ্যে সে কত পথই না অতিক্রম করেছে। কত বিচিত্র অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছে তাকে। এ যাত্রা কুমারায়ণের অভিজ্ঞতায় আর এক সংযোজন। সে পায়ে পায়ে পটাবাসের বাইরে বেরিয়ে আসে।

একটা শব্দ ভেসে আসছে। শেষ রাতের হাওয়া যেন মৃত পশুদের পঞ্জর ও করোটী ভেদ করে উঠে আসছে হাহাকার শব্দ করতে করতে এ শব্দে বুক কেঁপে ওঠে যাত্রীদের, কিন্তু অসীম সাহসী কুমারায়ণ মরুবক্ষে উত্থিত এই ভয়ঙ্কর শব্দের উৎস অনুসন্ধান করতে থাকে।

ভোর হয়, থেমে আসে বায়ুপ্রবাহ। শব্দের তীক্ষ্ণতা কমতে কমতে নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

আবার চলা, আবার বিশ্রাম। এখন সীতানদীর তীর ধরে চলেছে তারা।

বিংশতি দিবসের মরুযাত্রা অবশেষে সমাপ্ত হয় লবণহ্রদে এসে। সীতা-নদীর জলধারাও এই হ্রদে এসে তার দীর্ঘ পথযাত্রার সমাপ্তি টানে। উৎসমুখে তুষার বিগলিত হলে পূর্ণ হয় এ হ্রদ। ক্ষীণ জলধারা প্রবাহিত হলে হ্রদের অভ্যন্তরের বালুকারাশি সে জল শুষে নেয়।

লবণহ্রদ ও সীতানদীর অর্ধ যোজন স্থান ব্যাপী সবুজ তৃণ ও অরণ্যভূমি। কোথা থেকে একদল হরিণ কোন্ আদি যুগে এখানে এসে পড়েছিল। তাদেরই সন্তান-সন্ততিতে পূর্ণ হয়ে আছে অঞ্চলটি।

অভাবনীয় মৃগকুলের সমাবেশ।

শিবির স্থাপন করা হয়েছে সন্ধ্যা লগ্নে। কামকান্তি আর কুমারায়ণ অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ করে একবার বহির্গত হল। তারা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে লাগল।

সীতা নদীর ক্ষীণ জলধারা এসে পড়ছে লবণহ্রদের মধ্যভাগে। যেখানে জল এসে পড়ছে সেখানে সেই- জলসম্ভার যেন পাতালের নাগলোকের নাগেরা মুহূর্তে শুষে নিচ্ছে। সারা হ্রদের জলহীন ঈষৎ সিক্ত বালুকা পিপাসার্ত রসনার মত পূর্ণ জলের প্রত্যাশায় পড়ে আছে। বৃক্ষের আড়ালে পূর্ণিমার চন্দ্রোদয় হল। যেখানে সীতানদীর জলধারা এসে হ্রদে পড়ছে সেই জলস্রোতের দুইপার্শ্বে নেমে এসেছে হরিণের বৃহৎ একটি দল। তারা জলপান করছে।

কামকান্তি বললেন, মধ্যাহ্নের কিছু পূর্বে আর এই সন্ধ্যা লগ্নে হরিণেরা হ্রদের বুকে নেমে এসে ঐ স্রোতোধারায় জলপান করে। আমাদের মৃগয়া শুরু হবে কাল মধ্যাহ্নের কিছু আগে।

একটু থেমে পরিকল্পনাটির পূর্ণ রূপদান করলেন কামকান্তি।

আপনি কুমারায়ণ, কাল হ্রদের ওপারে বৃক্ষের আড়ালে অশ্বারোহণে অপেক্ষা করবেন। মধ্যাহ্নে জলপান করতে আসবে মৃগের দল। আমরা ওদের পলায়নের

পথ বন্ধ করে আপনার দিকেই তাড়না করব। আপনি সেই অবকাশে অশ্ব চালনা করে নেমে আসবেন শুষ্ক হ্রদের বুকে। পশ্চাতে তাড়া খেয়ে সামনে বাধা দেখে ওরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে শূন্যে লাফিয়ে উঠবে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ওদের লক্ষ্য করে আপনি শর সন্ধান করবেন।

কুমারায়ণ বলল, অসামান্য পরিকল্পনা আপনার কামকান্তি। যথার্থ মৃগয়া-বিলাসী আপনি।

হা-হা করে হেসে উঠলেন মহারাজ কামকান্তি। মুহূর্তে হ্রদের বুক থেকে অস্বাভাবিক এক ধ্বনি শুনে অদৃশ্য হয়ে গেল হরিণের দল।

পরদিন মধ্যাহ্নে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে মরুভূমি। পূর্ব পরিকল্পনা মত হ্রদের ওপারে অশ্বারোহণে প্রতীক্ষা করছে কুমারায়ণ।

ঐ তো জলধারা বেয়ে নেমে আসছে হরিণের দল। তারা জলপান করছে। তূণীরে তীর, হাতে ধনু শর, কুমারায়ণ উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে আছে। কখন ওঠে মৃগ বিতাড়নের কোলাহল, অমনি অশ্বারোহণে নেমে যাবে বিদ্যুৎ-গতিতে।

সহসা প্রচণ্ড কোলাহলে বিদীর্ণ হল মরু-তপ্ত বাতাস। ওপারের বনভূমি আলোড়িত করে বেরিয়ে এলো কামকান্তি সদলবলে।

হরিণেরা প্রাণভয়ে ছুটে আসছে এপার লক্ষ্য করে! কিন্তু সহসা থমকে দাঁড়াল কিসের আশঙ্কায়! কে যেন নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশ নিষেধের তর্জনী তুলে ধরল।

কুমারায়ণ শ্বেত অশ্বপৃষ্ঠে নেমে আসছে বিদ্যুৎগতিতে। ওপার থেকে কৃষ্ণ একটি অশ্বে কিছু পথ নেমে এসে অশ্বের রাশ টেনে ধরল কামকান্তি।

সহসা একি হল! অশ্বসমেত কুমারায়ণকে গ্রাস করতে লাগল ধরিত্রী। চোরা-বালির মৃত্যু-গহ্বর ক্ষুধার্ত অজগরের মত উদরের গভীরে টানতে লাগল তাকে।

বিহ্বল কুমারায়ণ অশ্ব থেকে লাফ দিয়ে পড়ল, কিন্তু পরিত্রাণের পথ নেই। পদতলের বালুকা পিচ্ছিল সরীসৃপের মত সরে সরে যাচ্ছে।

কুমারায়ণ দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করে আর্ত চীৎকারে কামকান্তিকে সাহায্যের জন্য আকুল আহ্বান জানাল।

গগন বিদীর্ণ করে অট্টহাসি হেসে উঠল কামকান্তি। হাসির শব্দে হরিণেরা ঝড়ের মুখে শুকনো পাতার মত উড়ে চলে গেল অরণ্যের গভীরে।

কুমারায়ণ চোখের সামনে দেখতে পেল মহা নিপাত। তার হাত চলে গেল তূণীরের প্রকোষ্ঠে। পারাবতটিকে দু'হাতে তুলে ধরে উড়িয়ে দিল আকাশে। শিক্ষিত পারাবত ডানা মেলে উড়ে চলল কুচী অভিমুখে।

সবিস্ময়ে কামকান্তি তাকাল পারাবতের দিকে। ক্ষণকাল মাত্র। মুহূর্তে হাতের ধনু তুলে ধরল উড়ন্ত পাখি লক্ষ্য করে।

তীর আর ছোঁড়া হল না। কুমারায়ণ শেষবারের মত হাতে তুলে নিয়েছে ধনু। অব্যর্থ লক্ষ্যে তার নিক্ষিপ্ত তীর কামকান্তির বক্ষ বিদীর্ণ করে বেরিয়ে গেল। কৃষ্ণ অশ্বটি সম্মুখের দুটি পা ঊর্ধ্বে তুলে তীব্র হ্রেষাধ্বনি করে উঠল। হ্রদের বুকে নিক্ষিপ্ত হল কামকান্তির প্রাণহীন দেহ।

বালির অতলে তলিয়ে যেতে যেতে কুমারায়ণ দেখল, চোখের ওপর প্রদীপ্ত সূর্য চিতার মত দাউ দাউ করে জ্বলছে, আর তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে এক নারী!

কে! কে ও!

এ জীবনে কুমারায়ণের মুখ দিয়ে এই শেষ বাক্য উচ্চারিত হল।

পৃথিবীর আলো মুছে যাবার আগে কুমারায়ণ চিনতে পারল সে নারীকে। তীব্র অন্তর্ভেদী দৃষ্টি মেলে তারই দিকে চেয়ে আছে বেতসা।

অনির্বাণ

দ্বিতীয়পর্ব

একদল অশ্বারোহী রেশম পথ ধরে বিদ্যুৎ-চমকে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেল পূব থেকে পশ্চিমে। পাথরের স্তূপের আড়াল থেকে রুদ্ধশ্বাসে তাদের দেখতে লাগল ভিক্ষুণী। সাত বছরের শিশুপুত্রটি মায়ের মুখের দিকে চেয়ে বসে রইল। তার শিশু মনও কি যেন একটা আতঙ্কের আঁচ পেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

দূরে শোনা গেল প্রাণ বিদীর্ণ করা আর্তনাদ। দস্যুরা নিঃসন্দেহে কোনো বণিক দলের ওপর চড়াও হয়েছে।

তিনদিন এক পরিত্যক্ত চৈত্যের মধ্যে আত্মগোপন করে আছে মা আর ছেলে। পাহাড়ের স্তূপ আর গজিয়ে ওঠা ঝোপঝাড় বৃক্ষে স্থানটি সমাচ্ছন্ন।

এক সময় দীর্ঘ দিনের অবসানে সন্ধ্যার ছায়া নেমে এল। কিউনলুন পর্বতমালার কোনো এক শিখর ছুঁয়ে চন্দ্রের উদয় হল। বাইরে বৃক্ষপত্রে পদধ্বনি শুনে শিশুটি মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, মা, পূজারী দাদু এসে গেছে।

পূজারী চৈত্যের ভেতর ঢুকে বাতি জ্বালিয়ে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করলেন। তারপর মৃদুস্বরে ডাক দিলেন, মা, বেরিয়ে এসো।

ভিক্ষুণী ছেলের হাত ধরে বেরিয়ে এল স্তূপের আড়াল থেকে। চৈত্যের ভেতর প্রবেশ করে বসল প্রস্তরের মসৃণ মেঝেতে। বর্তিকার স্বল্প আলোয় গুহার অভ্যন্তরে দেয়াল-চিত্রগুলি যেমন রহস্যময় তেমনি জীবন্ত বলে মনে হচ্ছিল। রং এত উজ্জ্বল, বিষয় এমন প্রাণবন্ত যে মনে হচ্ছিল অঙ্কিত চরিত্র-গুলি চোখের সামনে অভিনয় করে চলেছে।

ভিক্ষুণীর বয়স অষ্টাবিংশতি বর্ষ। অতি উচ্চ বংশোদ্ভব বলে মনে হয়। সুষমামণ্ডিত পূজারিণী-মূর্তি। সপ্তমবর্ষীয় বালকটির সঙ্গে তাঁর দেহ-সৌষ্ঠবের কিছু পার্থক্য ছিল। ভিক্ষুণীর কেশ মধুবর্ণ, আঁখি তারকায় নীলের ছোঁয়া। কিন্তু বালকের কেশ ও আঁখি তারকার বর্ণ ভ্রমর-কৃষ্ণ।

ভিক্ষুণী ধীর কণ্ঠে বলল, বাবা, আজ একটা আর্তনাদ শুনলাম, মনে হল, দস্যুদল কোনো সার্থবাহের দলকে আক্রমণ করেছে।

ঠিকই শুনেছ মা। হূন দস্যুরা হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে সোনার বুদ্ধমূর্তি। তারা দলে দলে ছড়িয়ে পড়েছে উত্তর আর দক্ষিণের রেশম পথে। তাদের ধারণা, তিয়েনশান পর্বতের সানুদেশে বৌদ্ধবিহার থেকে যে স্বর্ণ মূর্তিটি অপহৃত হয়েছে, সেটি কোনো বণিকদলের কর্ম। তাই তারা শুধু তিয়েনশান নয়, কিউনলুনের পাদদেশে প্রসারিত রেশম পথটিকেও পাহারা দিয়ে চলেছে।

ভিক্ষুণী বুদ্ধ-মূর্তিটি ঝুলি থেকে বের করে বসিয়ে দিল প্রস্তর বেদীর ওপর। কি অপার আনন্দময় মূর্তি, বরাভয় মুদ্রায় বসে আছেন বুদ্ধ, তথাগত। স্বল্প দীপালোকেও ঝলমল করে উঠছে রাজ-রাজেশ্বরের দেহ।

পূজায় বসলেন পূজারী। করজোড়ে প্রার্থনায় বসল ভিক্ষুণী। শিশু-পুত্রটিও জননীর পাশে জোড়হস্তে নতজানু হয়ে রইল। কোনো ভেরী বাজল না, কোনো ঘণ্টাধ্বনিও শোনা গেল না।

পূজা শেষে পূজারী বললেন, প্রভুর কৃপায় এই পরিত্যক্ত চৈত্য আজ তিনদিন নন্দনলোকে রূপান্তরিত হয়ে গেল মা। তিনিই তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন এখানে। প্রভু আমাকে আজ এই শিক্ষা দিলেন, যেখানে শূন্য সেখানেই বিরাজ করছে পূর্ণ।

ভিক্ষুণী বলল, কিন্তু বাবা, মনের একটি ক্ষত থেকে যে নিরন্তর রক্ত ঝরে পড়ছে, তাকে রোধ করি কোন সান্ত্বনার প্রলেপে? নিরপরাধ বণিকদলের কেন এই নির্যাতন?

নিরীহ বণিকদল নির্যাতীত হচ্ছে, তাতে তোমার তো কোনো অপরাধ নেই মা। তোমার রাজকুল থেকে প্রদত্ত এই মূর্তি। তুমি ভিক্ষুণী হয়ে তাঁর পূজায় নিযুক্ত। তুমি তাঁকে নিয়ে চলেছ সেই দেশে যেখান থেকে একদিন তাঁর মৈত্রীর বাণী ছড়িয়ে পড়েছিল দিকে দিকে।

প্রভুকে যে এতদিন সর্ব জীবের প্রতি করুণাময় জেনে এসেছি বাবা।

মৃদু হেসে পূজারী বললেন, কোন্ পথে তাঁর করুণা নেমে আসবে সে কি কেউ বলতে পারে মা। ঐ যে সামনের ঝর্ণা, একদিন বুকের মধ্যে তুষার গলা জল নিয়ে বয়ে যেত, কত মানুষ সংসার পেতেছিল তার দুই তীরে, আজ সে ঝর্ণাও শুকিয়েছে, মানুষজনও চলে গেছে ঐ নীচের উপত্যকায়। পূজা নিয়ে কেউ আর এত ওপরে উঠে আসে না। এ বুড়ো বয়েসে তাঁরই ডাকে আমাকে আসতে হয় পাহাড় ভেঙে। এ বিপদের দিনে তিনি নিজেই তোমাদের ডেকে নিয়ে এলেন তাঁর আশ্রয়ে, এ কি কম করুণা।

ভিক্ষুণী নীরবে শুনল বৃদ্ধ শ্রমণের কথাগুলি। সে দেখল প্রভুর প্রশান্ত মুখে লেগে আছে সে কথার সমর্থন।

পঞ্চম দিনের প্রভাত তখনও রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে আবির্ভূত হয়নি, তিনটি ছায়ামূর্তি বেরিয়ে গেল চৈত্য ছেড়ে। তারা পামীরের দুর্গম মালভূমির পথেই দক্ষিণে অগ্রসর হতে লাগল।

প্রভাতের কৈশোর-কমনীয়তা যখন যৌবনের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত তখন পূজারীকে প্রণতি জানিয়ে ভিক্ষুণী বলল, বাবা, এই অশক্ত শরীরে আপনি অনেকখানি পথ অতিক্রম করেছেন এখন অনুগ্রহ করে স্বস্থানে ফিরে যান। আমাদের যাত্রাপথে কেবল আপনার আশীর্বাদ প্রার্থনা করি।

পূজারী বললেন, প্রভুর আশীর্বাদেই তোমার যাত্রা সফল হবে মা।

বন্ধুর পার্বত্য পথে মা ও ছেলে সাতদিন অতিক্রম করার পর এক সন্ধ্যায় এসে পৌঁছল তুষারাচ্ছাদিত এক পর্বতের সানুদেশে। প্রভু বুদ্ধের কৃপায় এখানেও তারা লাভ করল একটি গুহার আশ্রয়। যতদূর দৃষ্টি যায় তরুলতার চিহ্নমাত্র নেই। রাত্রি অধিক হবার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে ঝড়ের গর্জন শোনা যেতে লাগল। শুরু হল প্রচণ্ড শৈত্য-প্রবাহ। প্রভুর নাম জপ করতে লাগল ভিক্ষুণী। এক বক্ষে সোনার বুদ্ধমূর্তি, অন্য বক্ষে সন্তানকে ধারণ করে সে প্রতীক্ষা করতে লাগল প্রভাতের। প্রবল বায়ু যখন নৈশ অন্ধকার বিদীর্ণ করে বয়ে যাচ্ছিল তখন মনে হচ্ছিল সহস্র হূন ও তাতার অশ্বারোহী দিগ্‌বিদিক কাঁপিয়ে ছুটে চলেছে।

গুহার অভ্যন্তরে সামান্যমাত্র বায়ু প্রবেশ করলেই শীতের শ্বাপদের দংশনে অস্থির হয়ে উঠছিল গুঁহাবাসীরা। কিন্তু প্রভুর অপার কৃপায় রজনীর শেষ যামে তুষারপাতের ফলে গুহামুখ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়ে তীক্ষ্ম ঝড়ের হাওয়া প্রবেশের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল। গুহা মুখে বসে সন্তানকে শীতের দংশন থেকে রক্ষা করে প্রভাতের জন্য প্রহর গণনা করছিল জননী। শেষ রাত্রিতে ঝড় থেমে গিয়ে এক অদ্ভুত জ্যোতি ছড়িয়ে পড়েছিল চরাচরে। গুহার বরফাচ্ছাদিত রন্ধ্রপথে সেই জ্যোৎস্নাধৌত জ্যোতির্লোকের দিকে তাকিয়ে ভিক্ষুণীর স্মৃতির দ্বার ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হয়ে গেল। সে দেখল, এক তরুণ কুমার তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কুমার বলল, কোনো ভয় নেই। আমার হাত ধর। বিপদের পথে আমি হব তোমার সঙ্গী।

বহু দুর্গম পথ অতিক্রম করে একদিন তারা এসে পৌঁছল এক স্বর্গরাজ্যে। সেখানে বহু সমারোহে পালিত হল তাদের মিলন-উৎসব।

কুমার বলল, জীবা, আমাদের সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হবে তখন উভয়ের মিলিত নামেই সে হবে পরিচিত।

জীবা পরম আগ্রহে প্রিয়তমের হাতখানি বুকের মধ্যে নিয়ে বলল, বল কুমার কি হবে তার নাম?

কুমারজীব।

অভিনব। জনকজননী বেঁচে থাকবে চিরকাল পুত্রের নামের মধ্যে।

তাই তো কাম্য জীবা। পুত্র হোক জগৎ বিখ্যাত, পিতা-মাতা থাক তার খ্যাতিতে লীন হয়ে।

সহসা ঈশান কোণ থেকে ছুটে এল দুরন্ত এক ঝড়। জীবার কাছ থেকে সেই ঝড়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে চিরদিনের মত হারিয়ে গেল কুমার। শুধু স্মৃতি-চিহ্নরূপে থেকে গেল তাদের সম্মিলিত কামনার ধন কুমারজীব।

প্রবল শীতের মধ্যে জননীর উত্তপ্ত কোলের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে কুমারজীব পার্শ্ব পরিবর্তন করামাত্র বন্ধ হয়ে গেল জীবার স্মৃতিরোমন্থন। জীবা আবেগে চুম্বন করল পুত্র কুমারজীবকে।

ভোরের আলো ফুটে উঠল একসময়। বরফের স্তূপ সরিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে এল মাতাপুত্র। প্রস্তরাকীর্ণ গিরিপথ। তার ওপর বরফের শ্বেত আস্তরণ পাতা। পদে পদে পদস্খলনের সম্ভাবনা।

কুচীর রাজকন্যা হলেও জীবা শ্রমণী, তাই কষ্ট সহিষ্ণুতা তার ধর্ম। তাছাড়া তিয়েনশান পর্বতমালার কোলে আশৈশব কাটানোর ফলে তাকে মুখোমুখি হতে হয়েছে তুষারপাতের। তবে পামীরের এই নুড়িপাথর পরিকীর্ণ পথটি সম্বন্ধে তার কোনো ধারণা ছিল না। সারারাত তুষারপাতের ফলে প্রস্তরগুলি শুভ্র আস্তরণের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, তাই সহজ ছিল না পথ অতিক্রম করা। নুড়িগুলি এমনি শিথিল যে পদপাতের সঙ্গে সঙ্গে তা সরে সরে যাচ্ছিল, যার ফলে ভিক্ষুণী সন্তান নিয়ে রোধ করতে পারছিল না পতন।

অল্পকালের মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়ল ভিক্ষুণী। সে ঐ তুষারের ওপরেই অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সূর্যের আলো কাঁচা সোনার মত ছড়িয়ে পড়েছে পর্বতের চূড়ায়। সেই সোনার ঢল ধীরে ধীরে তুষার প্রবাহের মত নেমে আসছে পর্বতের গা বেয়ে। সে এক অবর্ণনীয় শোভা। ভিক্ষুণী জীবার মনে হল, প্রভুর করুণা নেমে আসছে আলোর ধারা হয়ে। সত্যিই তাই এলো। পর্বতের সানুদেশ একসময় প্লাবিত হয়ে গেল আলোর বন্যায়। ধীরে ধীরে গলে যেতে লাগল তুষারের আস্তরণ। মনে হল, কেউ যেন শুভ্র একখানা চাদর উৎসবের শেষে গুটিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে।

সহসা ভিক্ষুণী জীবার চোখ আটকে গেল পর্বতের দক্ষিণ প্রান্তে। একটি খরস্রোতা জলধারা হাওয়ায় ভেসে যাওয়া গতিশীল মৃগের মত কিছু পথ ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে গভীর গিরিখাদে।

সোনার বুদ্ধ মূর্তিটি বুকে জড়িয়ে ভিক্ষুণী চোখের জলে ভাসতে লাগল। প্রভাতে ঐ গিরিনদীর ওপরেও শুভ্র তুষারের আস্তরণ বিছানো ছিল। তখন অদৃশ্য ঐ নদীকে চিহ্নিত করা ছিল প্রায় দুঃসাধ্য এক ব্যাপার। সেই প্রথম প্রভাত মুহূর্তে পুত্রের হাত ধরে যদি ঐ নদীর ওপর বিছানো শুভ্র আস্তরণে পা ফেলে জীবা যাত্রা করত, তাহলে সে যাত্রা গিয়ে থামত ঐ খাড়াই গিরিখাদের অতল তলে।

নদীর ধারে পর্বতের বাঁকে এসে দাঁড়াল একটি মানুষ। পেছনে একটি ভেড়া। লোকটির বুকের মধ্যে তার বাচ্চা। মানুষটি নদীর ওপর জমে থাকা কঠিন তুষারস্তূপে পা ফেলে পেরিয়ে এল এপারে।

জীবার সামনে এসে লোকটি কেমন যেন হতচকিত হয়ে গেল। তার বিস্ময়ের কারণ, এই দুটি প্রাণী রাতের প্রচণ্ড তুষার ঝড়ের মধ্যে কাটাল কোথায়!

পরমুহূর্তে তার মনে হল, সামনের গুহাটি প্রবল ঝড়ের হাত থেকে তাদের রক্ষা করেছে।

জীবা বলল, আপনি কি এই অঞ্চলের অধিবাসী?

প্রৌঢ় মেষপালক হুব্বা ভিক্ষুণী জীবার কথায় অভিভূত হয়ে গেল। সামান্য মেষপালককে কেউ সম্মান দেখিয়ে 'আপনি' সম্বোধনে কথা বলবে এ যে তার ভাবনারও বাইরে। তাছাড়া এই মহিলা তো সামান্য নয়, এর রূপ এর পোশাক-পরিচ্ছদ সত্যিই অসামান্য। হুব্বার মনে হল, কোনো অলৌকিক জগৎ থেকে এ নারী সহসা তার সামনে আবির্ভূত হয়েছে। সে সসংকোচে বলল, আমি হুব্বা, ভেড়া চরিয়ে বেড়াই। আমাকে সম্মান দেখিয়ে কথা বললে আমারই পাপ হবে মা।

প্রভু বুদ্ধের কাছে সকলেই মানুষ বাবা। তাঁর কাছে ভিক্ষুক আর রাজায় কোনো তফাৎ নেই।

হুব্বা বলল, আমরা কিরঘিজ মা, আমরা গরুভেড়া নিয়ে কিলিক গিরিপথের আশেপাশে চরিয়ে বেড়াই।

জীবা বলল, শুনেছি কিরঘিজরা লোক হিসেবে খুবই ভাল।

হুব্বা বলল, ভালমন্দ বুঝিনা মা, ঘুরে বেড়াই আকাশের তলায়, শুয়ে থাকি ঘাসের বিছানায়। মক্কির রুটি পাকাই চমরীর দুধে চুবিয়ে খাই। কোনো অতিথি পথের মাঝে এসে পড়লে আমরা মনে করি স্বর্গ থেকে কোনো দেবতা নেমে এল। আমাদের সামান্য যা থাকে তাই দিয়ে তার আপ্যায়ন করি।

ভিক্ষুণী জানতে চাইল, এদিকে কোথায় চললে বাবা ?

যাযাবর কিরঘিজটি কিছু সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। এক সময় কাতর কণ্ঠে বলল, আমি আমার ছেলেকে দেখতে এসেছি মা।

তোমার ছেলে ! সে কোথায় থাকে ? এদিকে তো কোনো ঘরবাড়ি নজরে পড়ল না।

সে অনেক কথা মা। আমার ছেলেটা আস্ত একটা পাগল ছিল। ছোট ছেলে, তবু দলছুট হয়ে এদিক-ওদিক ঘোরা চাই। মা ছিল না, তাই বোধহয় পেছুটানও ছিল না তার।

ভিক্ষুণী জীবা সাগ্রহে শুনতে লাগল এই সহজ সরল যাযাবরটির কথা।

একটু থেমে হুব্বা বলল, গরমের দিনগুলোতে আমরা পশুর পাল নিয়ে ওপরের পাহাড়ে আসি। সেবারও এসেছিলাম। এই পাহাড়ের একটু নীচে অনেক বড় একটা চারণভূমি আছে। সেখানে আমরা পশু চরিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ আমার বারো বছরের ছেলেটা উধাও হয়ে গেল। জানতাম মা, এটা ওর রোগ। আর এও জানতাম এদিক-ওদিক ঘুরে-ফিরে ও আবার ফিরে আসবে ডেরায়। কিন্তু সাঁঝ ঘনিয়ে এল, ছেলেটা আর ফিরে এল না। রাতে ঝড় উঠল। ভোরে জেগে উঠে দেখি পর্বতের সারা গা বরফে ঢাকা। আমি ছুটে এলাম মা এই পথে। ওকে খুঁজে পেলাম। তুমি যেখানটিতে দাঁড়িয়ে আছ তার একটু ডাইনে। সাদা বরফের চাদরখানা গায়ে জড়িয়ে যেন ঘুমিয়ে আছে।

জীবা নিজের ছেলের গায়ে হাত রেখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

লোকটি তার ভেড়া আর ভেড়ার বাচ্চা নিয়ে এগিয়ে এল সেই জায়গাটিতে যেখানে কয়েক বছর আগে তার কিশোর পুত্রটি রাতের তুষার ঝড়ে সমাধিস্থ হয়েছিল।

লোকটি থলির ভেতর থেকে শুকনো রুটি আর কিছু খাবার বের করে ঐ জায়গাটার ওপর রাখল। তারপর ভেড়ার দুধ দুইয়ে ঐ খাবারগুলো ভিজিয়ে দিলে।

এবার জীবার দিকে তাকিয়ে ধরা গলায় বলল, যেদিন ও দল থেকে বেরিয়ে যায় সেদিন কিছু খেয়ে আসেনি, তাই প্রতি বছর এমন দিনে ওকে একবার করে খাইয়ে যাই। ওর মা থাকলে কি না খেয়ে পালিয়ে আসতে পারত।

জীবা শুধু বলল, তোমার ছেলে পরম করুণাময় বুদ্ধের চরণে আশ্রয় লাভ করুক, এই কামনা করি।

যাযাবর কিরঘিজটি জীবার প্রার্থনার মর্ম উপলব্ধি করতে না পারলেও এটুকু বুঝল যে, এই দেবীমূর্তি তার ছেলের মঙ্গলেব জন্যই কোনো দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাল।

এবার হুব্‌বা তার ডেরায় ফিরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, কোন দিক থেকে আসছ মা, আর যাবেই বা কোথায় ?

বহুদূর উত্তরে কুচী রাজ্য থেকে আসছি আমি, যাব দক্ষিণে ভারতবর্ষে।

বণিকদের কাছ থেকে এ দুটো জায়গার নাম শুনেছি মা, তবে কোথায় তা জানা নেই।

জীবা গুহাটির দিকে আঙুল তুলে বলল, কাল ঝড়ের ভেতর আমরা ঐ গুহাতেই আশ্রয় নিয়েছিলাম। সকালে উঠে দেখি সামনের ঐ পাহাড়ী নদীটি বরফে ঢাকা। দেখতে দেখতে সূর্যের তাপে বরফ গলে গেল আর নদীটি তার ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল। ভাগ্যে পা পড়েনি বরফ ঢাকা নদীর ওপর তাহলে একেবারে খাদে গিয়ে পড়তে হত।

হুব্‌বা বলল, এখন কোনো ভয় নেই, তুমি এসো মা আমার সঙ্গে। আমিই তোমাদের ওপারে পার করে দেব।

অতি সাবধানে শক্ত বরফখণ্ডের ওপরে পা রেখে রেখে হুব্‌বা মা ও ছেলেকে নদী পার করে নিয়ে এল।

একটু নীচেই সবুজ ঘাসের চারণভূমি। শত শত ভেড়ার পাল আর চমরী চরছে। বিচ্ছিন্নভাবে তাঁবু পড়েছে দু'দশটি। রঙিন পোশাক পরা মেয়েরা তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এসে বাসনকোসন মেজে ঘরে তুলছে।

হুব্‌বার সঙ্গে ছেলের হাত ধরে ভিক্ষুণী জীবা এসে দাঁড়াতেই চারণভূমিতে হৈ-চৈ পড়ে গেল। কোথা থেকে এল মেয়ে। এ তো তাদের মত যাযাবর নয়। কুচীর ভাষার সঙ্গে শুলী (কাশগড়) দেশের ভাষার তফাৎ আছে। আবার

পামীরের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা এক নয়। কিন্তু কুচীর রাজকন্যা জীবা প্রখর বুদ্ধিশালিনী। সে কুচীতে আগত বণিকদের কাছ থেকে নানা অঞ্চলের ভাষা শিখে নিত। বণিকরা চলার পথে একই অঞ্চলের ওপর দিয়ে বহুবার আসা-যাওয়া করার ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষায় রপ্ত হয়ে উঠত। স্বাভাবিক আগ্রহের ফলে জীবার পক্ষে সেইসব ভাষা শিখে নেওয়া বড় একটা সময়সাপেক্ষ বা কঠিন ব্যাপার ছিল না। তাই কিরঘিজদের সঙ্গে উভয়পক্ষের বোধগম্য ভাষাতে মোটামুটি কথা চালিয়ে যেতে তার অসুবিধে হল না।

কিরঘিজ মেয়েরা ওকে কাছে পেয়ে আর ছাড়তে চায় না। ওর চুল কেন সোনালী, ওর চোখ কেন নীল, এইসব প্রশ্নের জবাব দিতে হল জীবাকে। কিরঘিজ জাতের মানুষগুলোই হাসিখুশিতে ভরা। তারা কুমারজীবকে চমরীর পিঠে চড়িয়ে তৃণভূমিতে ঘোরাতে লাগল। জীবা আর তার ছেলে তিনটি দিনের আগে অতিথিবৎসল কিরঘিজদের হাত থেকে ছাড়া পেল না।

ওদের কাছ থেকে চলে আসার সময় কিরঘিজ মেয়েরা মা আর ছেলের জন্য হাতে বোনা দু'খানা কম্বল দিল, ওজনে যা হাল্কা, গায়ে জড়ালে গরম। হুব্বা এক কাণ্ড করে বসল। সে জোর করে তার একটা চমরী গাই জীবাকে দিয়ে বলল, এ দুধও দেবে আবার দরকার মত তোমাদের বোঝাও বইবে। নিয়ে যাও মা, ভারী শান্তি পাব। আমার ধন আর কে নেবে বল।

জীবার সঙ্গে সঙ্গে হুব্বা এল কিছু পথ এগিয়ে দিতে। ফিরে যাবার সময় হুব্বাকে জীবা বলল, মা যেমন করে তার সন্তানটিকে ভালবাসে তুমি তেমন করে ভালবাসবে তোমার চারদিকের মানুষকে।

হুব্বা বলল, বড় ভাল কথা বলেছ মা, আমি সারাজীবন তোমার এ কথাটি মেনে কাজ করার চেষ্টা করব।

এ আমার কথা নয় বাবা, যিনি পৃথিবীর সবাইকে সমান চোখে দেখেন সেই বুদ্ধ করুণাময়ের কথা।

হুব্বা কুমারজীবকে কোলে তুলে আদর করল। তারপর হাতের পাতায় চোখের জল মুছতে মুছতে চলে গেল চারণভূমির দিকে। জীবার শেষ কথাটি যখন সে ভাবত তখন তার হৃদয়খানা আকাশ হয়ে যেত।

চমরী গাইটিকে তাড়াতে তাড়াতে ভিক্ষুণী জীবা এক সময় এসে পৌঁছল একটি হ্রদের ধারে। বিশাল হ্রদটি নীলকান্তমণির মত নীল জলে ভরে আছে। তার চারদিকে পর্বতশ্রেণী। কোনো কোনো পর্বতগাত্রের রঙ গৈরিক, কোনোটি বা নীলাভ। অধিকাংশ পর্বতশৃঙ্গ তুষার মুকুট মাথায় পরে জলের আরশিতে প্রতিবিম্ব দেখছে।

ক্লান্ত জীবা কাষ্ঠ নির্মিত পাত্রে জল ভরে নিল। আচমন, স্নানাদি করে পথের শ্রান্তি দূর করল। কুমারজীবও যথাবিহিত স্নান শেষে মায়ের পাশটিতে বসে দেখতে লাগল হ্রদের শোভা।

কি পরিষ্কার স্বচ্ছ জলের হ্রদ। মনে হচ্ছে জলের মধ্যে আর এক তুষার রাজ্য। সে জগৎ অলৌকিক, আশ্চর্য মায়াময়।

জীবা ভাবল একটি রাত্রি সে এই বিশাল জলাশয়ের কূলে কাটিয়ে দেবে। পর্বতগাত্র সংলগ্ন গুহার অভাব নেই এখানে।

দ্বিপ্রহরে আহার শেষ করে মাতা পুত্র হ্রদের তীর ধরে যাত্রা করল দক্ষিণে। এই পথেই তারা বেরিয়ে যাবে ভারতের দিকে। বেলা শেষে হ্রদের দক্ষিণ তীরে পৌঁছে রাতের আশ্রয়ের জন্য একটি গুহা খুঁজে নিল তারা।

সূর্যাস্তের রঙ তখন পশ্চিম আকাশ থেকে চুঁইয়ে পড়েছিল হ্রদের জলে। শ্বেতবর্ণের তুষারশৃঙ্গগুলি সেই জলে স্নান করে সিঁদুর বর্ণ ধারণ করেছিল। একঝাঁক হংস বলাকা উড়ে গেল পূব থেকে পশ্চিমে। তারা শূন্যের বুকে সুন্দর একটি ত্রিভুজ তৈরি করে উড়ে চলেছিল। তাদের পাখার শব্দ শুনে করতালি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল বালক কুমারজীব।

কৃষ্ণা প্রতিপদ তিথির চাঁদ উঠল পাহাড়ের আড়াল থেকে। মনে হল, কোনো দেবকন্যা তার লজ্জারুণ মুখখানা বের করে সরসীর আরশিতে নিজেকে দেখার চেষ্টা করছে।

রাত গভীর কুমারজীব ঘুমিয়ে পড়েছে। শ্বেত পুচ্ছ শিলার ওপর ছড়িয়ে চমরী গাভীটিও নিদ্রামগ্ন। একা জেগে আছে জীবা। চন্দ্র মধ্য গগনে। স্নিগ্ধ জ্যোতির্ময় মূর্তি। জীবার মনে হল, এক পরম সুন্দর পুরুষ এমনি এক নিশীথে চলে গেলেন কপিলাবস্তু ত্যাগ করে। পেছনে পড়ে রইল বহু আকাঙ্ক্ষিত প্রাসাদ বিলাস বৈভব। আর রইল পশ্চাতের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ পত্নী যশোধরা, পুত্র রাহুল।

সংসারের সীমা ভেঙে গেছে তাঁর কাছে। পরিবারের গণ্ডী, রাজ্যের গণ্ডী ভেঙে গিয়ে সারা বিশ্ব তাঁর ভাবনায় হয়ে উঠেছে এক নীড়।

জীবা নির্নিমেষ তাকিয়ে রইল মধ্যযামের চন্দ্রের দিকে। পৃথিবীর পর্বত, নদী, অরণ্য, সমুদ্র, লোকালয়, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে তার স্নিগ্ধ কিরণধারা। পক্ষপাতিত্ব নেই বিতরণে। ভুবন ভরে সাম্য আর মৈত্রীর প্রবাহ।

ভিক্ষুণী জীবার কণ্ঠ থেকে নির্গত হতে লাগল বুদ্ধ-বন্দনার সুর। ধর্মকে, সঙ্ঘকে, সবার ওপরে তোমাকে অনুসরণ করব প্রভু।

সঙ্গীতের জন্য বিখ্যাত কুচী রাজ্য। রাজকন্যা জীবা আশৈশব সঙ্গীত সাধিকা। তার কণ্ঠের স্তোত্রধ্বনি জলতলের ওপর দিয়ে সুরতরঙ্গ বিস্তার করে দূর থেকে দূরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

এক সময় নিশীথের অবসান সূচিত হল প্রভাতী বায়ু-প্রবাহে। জীবা পরম বিস্ময়ে দেখল, হ্রদের পশ্চিম পর্বত-দেহে সংলগ্ন হয়ে আছে চন্দ্র আর পূর্ব শৈল-শীরে নবোদিত দিবাকর।

হ্রদের সীমা অতিক্রম করে ওরা নামতে লাগল মালভূমির উৎরাই পথে।

অপরাহ্নকালে সহসা এক রূপলোক যাত্রীদের চোখের সামনে ফুটে উঠল। সবুজ অরণ্য-বৃক্ষের অন্তরালে পার্বত্য জনপদ। অরণ্যলোক ঘিরে ধূম্রবর্ণ পর্বত শ্রেণী। ঐ পর্বতের পশ্চাতে শুভ্র তুষার শোভিত শৈলমালা। সে এক মনোরম দৃশ্য। যাত্রা থামিয়ে জীবা পুত্রকে নিযে অপার বিস্ময়ে দেখতে লাগল সেই স্বর্গীয় শোভা।

এক সময় তারা নেমে এল অরণ্যঘেরা জনপদের কাছে। প্রস্তর ও কাষ্ঠ নির্মিত গৃহগুলি দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। রক্তিম ধ্বজা উড়ছিল কোনো মন্দির শীর্ষে। পাহাড়ের ঢালুতে ফলকর বৃক্ষ। ছোট্ট একটি নদীর ধারে ক্ষেতি। কয়েকজন ক্ষেতিকার গরু নিয়ে শস্য মাড়াইয়ের কাজে ব্যস্ত।

মানুষগুলি ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল জীবা আর তার পুত্রকে। এই সম্ভ্রান্ত যাত্রীরা যে সাধারণ বণিক নয় তা তারা বুঝতে পারল। তারা পরস্পর কি যেন পরামর্শ করল। একজন ছুটল গ্রামের দিকে।

অল্পবিস্তর সমতলের ওপরেই অরণ্যের অবস্থান। জীবা এতকাল পরে একটি গ্রামের মধ্যে প্রবেশের সুযোগ পেল। কিছু পথ অগ্রসর হতেই তারা গাছ-গাছালির অন্তরাল থেকে শুনতে পেল সঙ্গীতের শব্দ। ক্রমে সে শব্দ এগিয়ে আসতে লাগল। বালিকা কণ্ঠের সম্মিলিত সঙ্গীত-ধ্বনি।

জীবা পথের ওপরেই দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সম্মেলক সঙ্গীতের দলটি তার কাছে এসে থেমে গেল। বালিকাদের দলটির পেছনে গ্রামের আবাল-বৃদ্ধবণিতাকে দেখা যাচ্ছে। প্রবীণ এক ব্যক্তি এগিয়ে এল সামনে। বলল, আপনি দয়া করে আমাদের গ্রামে এসেছেন। আপনাকে অতিথি হিসেবে পেলে আমরা ধন্য হব।

সমস্ত শব্দগুলি পরিচিত না হলেও বহু ভাষাবিদ জীবার পক্ষে বিষয়টি বুঝে নিতে অসুবিধে হল না। সেও সবিনয়ে বলল, আপনাদের ভালবাসায় আমি বাঁধা পড়লাম।

কথা কটি বলে জীবা এমন এক নির্মল হাসি হাসল যা উপস্থিত গ্রামবাসী-দের অভিভূত করল।

এরপর কোনো আপত্তি না শুনে একটি বলিষ্ঠ পুরুষ কুমারজীবকে কাঁধে তুলে নিয়ে গ্রামের ভেতর যাত্রা করল। জীবার হাত ধরে বালিকার দল মহানন্দে চলল তাদের বসতি এলাকার দিকে।

মন্দির সংলগ্ন একটি গৃহে স্থান পেল জীবা আর তার পুত্র। প্রতিটি গৃহ থেকে জীবার জন্য এল আহার্য। জীবা কণামাত্র রেখে বাকী সবই ফিরিয়ে দিল গৃহস্বামীদের। কিন্তু সে লক্ষ্য করল, প্রতি গৃহ থেকে একটি করে শুষ্ক ডাল কিংবা একখণ্ড কাঠ রেখে যাওয়া হচ্ছে বিরাট এক উনুনের ধারে।

এটি হুণ্ডাদের গ্রাম। হুণ্ডারা বড় অতিথি বৎসল। এই গ্রামে ছোট্ট একটি বন আছে। হুণ্ডারা বড় সাবধানে ওই বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে। সেই কাঠ-গুলি তারা বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়ে গিয়ে জ্বালানি হিসেবে বিক্রি করে আসে।

জীবা মন্দিরের পুরোহিতকে এক সময় প্রশ্ন করে জানতে পারল, অতিথির শীত নিবারণের জন্য প্রতিটি গৃহস্থ তাদের মূল্যবান সঞ্চয় থেকে ঐ কাঠের টুকরোগুলি দিয়ে গেছে।

সাত দিনের আগে হুঞ্জাদের গ্রাম থেকে মুক্তি পেল না জীবা। ভিক্ষুণী জীবার আচরণে তারা এত মুগ্ধ হল যে প্রতি সন্ধ্যায় জীবার কথা শোনার জন্য তারা মন্দির প্রাঙ্গণে জড়ো হতে লাগল।

জীবা বুদ্ধের নানা জন্মের কাহিনীগুলি তাদের সামনে বলে যেত। তারপর সেইসব কাহিনীর ভেতর সংসারী মানুষের জন্য যেসব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, সে-সব বুঝিয়ে বলত। মানুষগুলি ছিল বড় সরল। তারা সকলেই ভিক্ষুণী জীবার কাছ থেকে গ্রহণ করল বুদ্ধের ধর্ম। এমনকি মন্দিরের পুরোহিতও নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে বৌদ্ধ শ্রমণে পরিণত হল। ভিক্ষুণী জীবা এই পুরোহিতের ওপর দিয়ে গেল প্রভু বুদ্ধের ধর্ম রক্ষার ভার।

আবার পথ। এখন সবচেয়ে দুর্গম বুজিল গিরিপথটি পার হতে হবে। এর চড়াই আর উৎরাই দুটিই বিপদজনক। সবে গ্রীষ্ম ঋতুর শুরু। পর্বত-দেহে ঘন বরফ থাকলেও সানুদেশ থেকে সরে গেছে বরফ। তাই চলার পথে তুষার থেকে পিছলে পড়ার সম্ভাবনা কম। তবু মা ও ছেলে সতর্কতার সঙ্গে পার হচ্ছিল গিরিপথ। কোথাও বহু নিম্নে দেখা যাচ্ছিল সূক্ষ্ম পথরেখা। কিন্তু সেখানে পৌঁছবার উৎরাই পথটি ছিল সম্পূর্ণ খাড়াই। এই খাড়াই পথে নামা ছিল খুবই বিপদজনক। জীবা একটি রজ্জুতে বেঁধে রেখেছিল কুমারজীবের কটিদেশ। সেই রজ্জুর একপ্রান্ত ছিল তার নিজের কোমরে বাঁধা। সে উৎরাই পথে পুত্রকে বলছিল, প্রভু তথাগতের ভক্তের কখনও পতন হয় না। তুমি সাহস সঞ্চয় করে নেমে যাও। কেবল পায়ের তলায় উপযুক্ত প্রস্তরের সন্ধান করে পা রেখো। নিম্নে খাদ কত গভীর সে কল্পনা মনে স্থান দিও না।

অলৌকিক প্রতিভাধর জাতক ছিল কুমারজীব। ইতিমধ্যেই সে মায়ের শিক্ষাধীনে থেকে বৌদ্ধ শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে উঠেছিল। তার চিত্ত ছিল স্থির। তাই সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করছিল মাতৃআজ্ঞা।

জীবা দুর্গম পথ অবরোহণ করতে করতে ভাবছিল, সংসারে যার চিত্ত স্থির সে অদেখাকে দেখতে পায়, অশ্রুতকে শুনতে পায়। সে পূর্ব থেকেই নিজেকে সবকিছুর জন্য প্রস্তুত রাখতে পারে।

জীবা পুত্রকে সম্বোধন করে বলছিল, সমতলভূমির ওপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড পড়ে থাকলে কেউ যেমন ভূতল স্পর্শ না করে নির্ভয়ে প্রস্তরের ওপর পা রেখে অবলীলায় চলে যেতে পারে, তুমিও সেইভাবে নির্ভয়ে চড়াই উৎরাই অতিক্রম করার চেষ্টা করবে।

দুর্গম গিরিপথ পার হয়ে ওরা একসময় এসে দাঁড়াল পর্বত নিম্নে। দূরে শৈলশ্রেণীর মধ্যবর্তী অরণ্য আর রৌপ্যসূত্রের ন্যায় গিরিনদী দেখা যাচ্ছিল।

জীবা বলল, চমরীটিকে হুণ্ডাদের কাছে রেখে এসে উপযুক্ত কাজই করা হয়েছে।

কুমারজীব বড় ভালবেসে ফেলেছিল গাভীটিকে। সে চমরীকে সঙ্গে আনতে না পারায় মনে মনে বড় কাতর হয়ে পড়েছিল। মায়ের মন্তব্য শুনে সে বলল, কেন মা ?

হয়ত পার্বত্য জীবটি আমাদের চেয়েও অবলীলায় নেমে যেতে পারত, কিন্তু যদি সে অক্ষম হত তাহলে তাকে যে কোনো স্থানে পরিত্যাগ করে চলে যেতে পারতাম না। সেক্ষেত্রে আমাদের পড়তে হত উভয় সংকটে।

একটু থেমে বলল, বাবা, কোনো বিষয়েই মায়ায় আবদ্ধ হতে নেই। মাকে ভালবাসবে কিন্তু সে ভালবাসা কখনো তোমাকে যেন মায়ায় বন্দী করে ফেলতে না পারে।

কিছু বুঝল, হয়তো বা কিছু বুঝল না কুমারজীব। সে মাকে গভীরভাবে বিশ্বাস করতেই শিখেছিল। মায়ের এক একটি বাক্য তার হৃদয়ে তথাগতের বাণীর অমৃতময় প্রতিধ্বনি বলে মনে হত।

সেদিন সন্ধ্যায় ওরা পর্বত সংলগ্ন একটি বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। অদূরেই দেখা যাচ্ছিল একটি গুহা। গুহার সম্মুখভাগে পড়েছিল বৃহদায়তন একখণ্ড শিলা।

জীবা চলার পথে সারাদিন কিছু ডালপালা সংগ্রহ করেছিল। সেই ডাল-পালা জড়ো করে চকমকি ঠুকে সে আগুন জ্বালিয়েছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল বাইরে যতক্ষণ না অসহ্য শীত পড়ছে ততক্ষণ এই বৃক্ষতলে বসেই নৈশ্য আহার ইত্যাদি প্রস্তুত করে নেবে। তারপর প্রয়োজনে আশ্রয় নেবে ঐ পর্বতগুহায়।

পরিকল্পনা মত কাজও করেছিল সে। হঠাৎ একটি কাশির শব্দে চমকে উঠল জীবা।

শব্দটা আসছিল গুহার দিক থেকে। অন্ধকারে কোনোকিছুই দেখা যাচ্ছিল না।

হঠাৎ আগুনের শিখায় জীবা দেখল একটি মনুষ্য-মূর্তি। গরমের পোশাকে সারাদেহ আবৃত করে দাঁড়িয়ে আছে সামনে।

পাশেই কুমারজীব নিদ্রামগ্ন। জীবা চিরদিনই নির্ভীক। সে স্পষ্ট কণ্ঠে তার মাতৃভাষায় জিজ্ঞেস করল, কে আপনি ?

আশ্চর্য ! পুরুষটিও কুচীর ভাষার জবাব দিল, আমি একজন বণিক।

আপনি কি কুচী কিংবা অগ্নিদেশ থেকে আসছেন ?

হ্যাঁ, সম্প্রতি আমি কুচী থেকেই আসছি। তবে আমি কুচীর মানুষ নই।

জীবা বলল, তা আমি বুঝেছি। আপনার আকৃতিতে কুচীর মানুষের আদল নেই।

আমি কাশ্মীরী বণিক।

আমরা কাশ্মীরে চলেছি। কিন্তু আপনার দলের অন্য বণিকেরা কই ? কোনো বণিক তো একা একা পথ চলেন না।

আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমরা একসঙ্গে প্রায় কুড়িজন পথ চলছিলাম। হূন দস্যুরা আক্রমণ করায় আমরা যে যেদিকে পেরেছি পালিয়েছি, আর একসঙ্গে মিলিত হতে পারিনি।

জীবা জানতে চাইল, ওদের আক্রমণের কারণ ?

কুচী নগরী থেকে নাকি একটি সোনার বুদ্ধমূর্তি চুরি গেছে। ঐ হূন দস্যুদের ধারণা, কোনো বণিক দলের এই কাজ। তাই তারা হন্যে হয়ে খুঁজছে ঐ সোনার মূর্তিটি লুঠ করে নোবার জন্য।

মূর্তিটি যে চুরি গেছে একথা ওদের কে বললে ?

আমি লোকমুখে যতটুকু শুনেছি, মূর্তিটি ছিল এক বৌদ্ধ বিহারে। সেখানে আর সে মূর্তিটি নাকি দেখা যাচ্ছে না।

এরপর জীবা নিরুত্তর রইল। লোকটি এবার আগুনের ধারে বসে হাত মুখ গরম করতে লাগল। একসময় জীবার দিকে চেয়ে বলল, আপনারা রাতে এই গাছতলাতেই কাটাবেন নাকি ?

জীবা বলল, উপায় কি, গুহা তো একটিমাত্র, তাও আকারে বড় নয়।

আমার কাছে ছোট একটি তাঁবু আছে। হয় আপনি গুহা নিন, নয়তো তাঁবু।

আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা নেই। আপনি যা দেবেন তাই নেব।

বণিকটি ক্ষণকাল কি যেন চিন্তা করে বলল, আপনারা গুহার ভেতরে থাকুন, আমি বাইরে তাঁবুতে থাকব।

জীবা তার প্রস্তুত করা কিছু খাদ্য লোকটির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, যৎসামান্য গ্রহণ করলে আমি বিশেষ তৃপ্তিলাভ করব।

লোকটি সাগ্রহে এবং সানন্দে জীবার দেওয়া খাদ্যবস্তু গ্রহণ করল।

রাতে ব্যবস্থামত গুহার ভেতরেই আশ্রয় নিল জীবা। বণিকটি বাইরে তাঁবুর ভেতর প্রবেশ করল।

অপরিচিত মানুষ সন্নিকটে, তাই বেশির ভাগ রাত জেগেই কাটাতে হল জীবাকে।

আকাশে ক্ষীণ শশাঙ্ক দেখা দিল ভোররাতে। তন্দ্রাচ্ছন্ন জীবা সহসা তাকিয়ে দেখল মানুষটি কখন উঠে তাঁবু গুটিয়ে নিয়েছে। সঙ্গে সামান্য যা বোঝা ছিল তাও বেঁধে নিয়েছে পিঠে। লোকটি গুহার দিকে একবার ফিরেও তাকাল না। নিঃশব্দে আলো অন্ধকারের ভেতর দিয়ে উৎরাই পথে নেমে গেল।

জীবা বণিকটির আচরণ সম্বন্ধে ভাবতে লাগল। তার মনে হল, বণিকটিকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। বণিকের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু হল, সময়। ঐ মানুষটি মনে মনে ভেবেছে, একটি নারী ও একটি বালকের সঙ্গে পথ চলতে

গেলে অনেকখানি সময় তার অযথা নষ্ট হয়ে যাবে। তার চেয়ে বিদায় না নিয়ে নিঃশব্দে চলে যাওয়াই শ্রেয়।

বণিকটি কিন্তু মনে মনে যাই ভাবুক, কার্যক্ষেত্রে ঘটল ভিন্ন রকম। সদাগরদের বাঁধাধরা পথ ধরে সে চলে গেল। জীবা চলল, অজানা, অচেনা পথ আবিষ্কার করতে করতে। যেখানে বাঁধা পথ ধরে এগোলে পাহাড় পরিক্রমা করতে হবে সেখানে তার আনাড়ী পা খাড়াই পথে নেমে অনেকখানি দূরত্ব কমিয়ে আনল। এমনিভাবে চলতে গিয়ে সে বণিকটির কিছু আগেই কাশ্মীরের সীমানায় পৌঁছে গেল।

কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশের বিভিন্ন দিক আছে। ঐ প্রবেশপথগুলির মুখে একটি করে শুল্ক-চৌকি থাকে। বণিকদের কাছ থেকে ঐ সকল প্রবেশ পথে কর আদায় করা হয়। তাছাড়া বিদেশী শত্রুর ওপরেও লক্ষ্য রাখা হয় ঐ প্রবেশ পথের সন্নিকটে কোনো সুউচ্চ বৃক্ষে অবস্থিত গৃহ থেকে।

জীবা প্রবেশ পথের সম্মুখে এসে পড়া মাত্রই রক্ষীরা তাকে আটকাল। পরনে ভিক্ষুণীর পোশাক, নিঃসন্দেহে বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী। কিন্তু অবয়বে জীবা বিদেশিনী। তাই রক্ষীরা তার ঝোলাঝুলি পরীক্ষা করে দেখতে চাইল।

সন্ধানে পাওয়া গেল সেই সোনার বুদ্ধমূর্তি। শৌল্কিক (শুল্ক গ্রহণকারী রাজকর্মচারী) বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় জিজ্ঞেস করল, কোথা থেকে আপনি আসছেন?

কুচী নগরী থেকে।

আমাদের কাশ্মীরী বণিকেরা পণ্য নিয়ে গোদান, শুলি, কুচী, অগ্নিদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে গমনাগমন করে থাকে।

জীবা বলল, আমারও সেকথা অজানা নয়।

আপনাকে দেখে নিশ্চিত অনুমান করতে পারি, আপনি বৌদ্ধ ভিক্ষুণী।

মশাশয়, আপনার অনুমান যথার্থ।

শৌল্কিক এবার প্রশ্ন করল, কিন্তু কি কারণে আপনার কাশ্মীরে আগমন, জানতে পারি কি?

এই বালক আমার একমাত্র সন্তান। শুনেছি কাশ্মীর বিদ্যাচর্চার একটি পীঠস্থান। আমি পুত্রের উপযুক্ত শিক্ষার আশায় এই মহান দেশে এসেছি।

সাধু পরিকল্পনা আপনার। সুদূর কুচী নগরীতে অবস্থান করেও আপনি যেভাবে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেছেন তাতে আমি বিস্মিত হয়েছি।

কুচী নগরীতে বৌদ্ধধর্ম-চর্চার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত আর পালি ভাষার চর্চাও হয়ে থাকে।

আপনি এখন কোথায় যেতে চান?

ভেবেছি নগরীতে প্রবেশ করে প্রথমে একটি আশ্রয়ের সন্ধান করব। তারপর উপযুক্ত ও অনুকূল সময়ে পুত্রের শিক্ষার একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

শৌল্কিক মানুষটি বণিকদের কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণে অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত হলেও বিদ্যাচর্চার প্রতি চিরকালই তার কিছু অনুরাগ আছে। সে বলল, আপনি ভিক্ষুণী, কিন্তু যুবতী। কাশ্মীরে সম্পূর্ণ নবাগতা। কাশ্মীর সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু'চার কথা নিবেদন করছি। হয়তো আপনার উপকারে আসতে পারে।

জীবা সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে বক্তার দিকে তাকিয়ে রইল।

শৌল্কিক বলতে লাগল, মহারাজ কনিষ্ক যে সাম্রাজ্য পত্তন করেছিলেন, পরবর্তী কুষাণ সম্রাটেরা তাকে রক্ষা করতে পারেননি। এখন সেই বিশাল সাম্রাজ্য খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত। যাঁরা কুষাণ সম্রাটদের দ্বারা রাজ্যের বিভিন্ন অংশ শাসনের কাজে নিযুক্ত ছিলেন সেই 'কিদার কুষাণে'রা এখন স্বাধীনভাবে সেই সকল অংশের অধীশ্বর। আপনি বুঝতেই পারছেন রাজ্য খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবার ফলে পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব কম। মাঝে মাঝে যুদ্ধ বিগ্রহের ভেতর দিয়ে শক্তি পরীক্ষাও হয়ে যায়।

একটু থেমে শৌল্কিক বলল, আপনি বুদ্ধিমতী, আপনাকে এতগুলি কথা বলার অর্থ হল, প্রতিটি পদক্ষেপে বিচার ও বিবেচনার প্রয়োজন।

জীবার কণ্ঠে কৃতজ্ঞতার সুর, আপনি অযাচিতভাবে যে উপদেশ দিলেন তা চিরদিন আমার মনে থাকবে।

শৌল্কিক বলল, আপনার এই সুবর্ণ নির্মিত বুদ্ধ মূর্তিটি সম্বন্ধে আমি কিছু প্রশ্ন করলাম না। আপনি বৌদ্ধ ভিক্ষুণী, তাই বুদ্ধের মূর্তি বহন করে নিয়ে চলেছেন। এর বেশী আমার জানার প্রয়োজন নেই।

শৌল্কিককে সকৃতজ্ঞ নমস্কার জানিয়ে জীবা সন্তানের হাত ধরে শ্রীনগর অভিমুখে অগ্রসর হতে লাগল।

বেশ কিছু পথ ঋজু বৃক্ষের ছায়াতপের মধ্য দিয়ে যাত্রা করে মা ও ছেলে এক প্রবাহিনীর তীরে এসে পৌঁছলো। লোক মুখে জানতে পারল, এই সেই বহুশ্রুত বিখ্যাত নদী বিতস্তা।

কূলে এসে উপলাস্তৃত ভূমিতে বসল দুজনে। নদীর ওপারে তখন তরী নিয়ে যাত্রা করেছে পাটনী।

হঠাৎ অশ্বখুরের ধ্বনি শুনে পশ্চাতে ফিরে তাকাল জীবা। প্রায় মুখোমুখি এসে দাঁড়াল তিনজন অশ্বারোহী। তারা একে একে ঘোড়া থেকে নামতেই জীবা উঠে দাঁড়াল। আশ্চর্য! পথে পরিচিত সেই কাশ্মীরী বণিকটিও অশ্বারোহণে এসেছে।

দ্রঙ্গাধিপ (শত্রু আগমন পর্যবেক্ষণের জন্য পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত উচ্চ মঞ্চে যিনি অধিষ্ঠান করেন) বললেন, ইনি নগরাধিপ (নগর পরিচালক)। আর ঐ বণিকটি নিশ্চয়ই আপনার পূর্ব পরিচিত।

জীবা মাথা নেড়ে জানাল, প্রশ্নকর্তার ধারণা সঠিক।

এবার নগরাধিপ কথা বললেন, আপনি যখন শৌল্কিকের সঙ্গে কথা বলছিলেন তখন মঞ্চ থেকে দ্রঙ্গাধিপ আপনার হাতে একটি সোনার বুদ্ধ মূর্তি দেখতে পান। উনি বৃক্ষের ওপর অবস্থিত পর্যবেক্ষণ মঞ্চ থেকে নেমে আসেন। শৌল্কিক ওঁকে জানান, আপনি ভিক্ষুণী, পূজার জন্য মূর্তিটি সঙ্গে রেখেছেন। কিন্তু .....

একটু থেমে নগরাধিপ বললেন, কিন্তু ওঁদের কথোপকথনের সময় এই বণিকটি উপস্থিত হয়। সে জানত না আপনার কাছে সোনার একটি বুদ্ধ মূর্তি আছে। তারপর ঐ বণিকের কাছ থেকেই শোনা গেল কুচীর বিহার থেকে সোনার বুদ্ধ মূর্তি অপহরণের কথা। হূন দস্যুদের হাতে বণিকদের লাঞ্ছনার কথা। এ বিষয়ে আপনার কিছু বক্তব্য আছে কি ?

সামান্য মাত্র। আমি রাজপরিবারের কন্যা। ভিক্ষুণী ব্রত গ্রহণ করে প্রাসাদ থেকে বিহারে যাবার সময় এই মূর্তিটি সঙ্গে নিয়ে যাই। হূন দস্যুরা ছদ্মবেশে নিশ্চয়ই এই মূর্তি বিহারে গিয়ে দেখে থাকবে। তারপর এক সময় মূর্তিটি নেই দেখে কোনো বণিকদল অপহরণ করে নিয়ে গেছে ভেবে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ভারতীয় বণিকদলের ওপর তাদের সন্দেহের কারণ, বৌদ্ধ বিহারে আরতির জন্য ওরাই চামর বিক্রয় করে। কোনো কোনো সময় বণিকদল বিহারের মধ্যেই রাত কাটায়। এখন হূন দস্যুরা যে স্বর্ণ মূর্তিটি লাভের সুযোগ খুঁজছিল, তা যদি অন্য কেউ অপহরণ করে তাহলে স্বভাবতই তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। অবশ্য এ সকল আমার নিজের অনুমান।

কথাগুলি বলে সে বুদ্ধ মূর্তিটি ঝুলি থেকে বের করে নগরাধিপদের দেখাল।

জীবার আড়ালে দ্রঙ্গাধিপের সঙ্গে আলোচনা করলেন নগরাধিপ। পরে জীবার দিকে ফিরে বললেন, আপনার কথায় সত্য থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু আমরা মহারাজ মেঘবাহনের অধিনস্থ কর্মচারী মাত্র। আপনি অনুগ্রহ করে রাজসমীপে চলুন। সেখানেই আপনার বক্তব্য রাখবেন।

জীবা সস্মিত মুখে বলল, এসেছি কাশ্মীরে, আপনাদের অনুগ্রহে রাজদর্শনও সম্ভব হচ্ছে, একি কম কথা !

শ্রীনগরে বিতস্তা নদীর কূলে মহরাজ মেঘবাহনের রাজধানী। নদীর তীরে উদ্যান বেষ্টিত রাজপ্রাসাদ। পশ্চাতে অরণ্য আর পর্বতের সবুজ, নীল আর শুভ্র সুষমা। অল্প দূরে পর্বত বেষ্টিত হ্রদ। গ্রীষ্মে ঐ হ্রদে নববধূর মত বিকশিত হয়ে উঠেছে শতদল পদ্ম।

কাষ্ঠ ও প্রস্তর নির্মিত ত্রিতল রাজপ্রাসাদ। প্রাসাদ শীর্ষে পিত্তল নির্মিত গম্বুজ। শ্বেত হংসের মত দুখানি প্রমোদতরণী প্রাসাদ সংলগ্ন ঘাটে বাঁধা রয়েছে। মহারাজ জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে ঐ তরণীতে প্রমোদবিহারে বহির্গত

হন। বিতস্তা থেকে যে নহরটি (খাল) হ্রদে গিয়ে পড়েছে, সেই নহর ধরে তরণী হ্রদে প্রবেশ করে। নহরের দুই তীরে দীর্ঘ কাণ্ড বিশিষ্ট পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষরাজি। এই নহরপথটি মহারাজের একান্ত ব্যক্তিগত ভ্রমণ-পথ। মহারানী অমর্তপ্রভার আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করার জন্য তিনি বিবাহের অব্যবহিত পরেই এই নহরটি খনন করে হ্রদের সঙ্গে যুক্ত করেন। সে আজ দশ বৎসর পূর্বের ঘটনা।

মহারানী ছিলেন মহারাজ মেঘবাহনের যথার্থ-ই হৃদয়েশ্বরী। রাজ অন্তঃপুরে তিনি ছিলেন পরিচারিকা পরিবৃতা একেশ্বরী। মহারানী চার বছর আগে মহারাজকে একটি চম্পক পুষ্প উপহার দিয়ে অকস্মাৎ অমর্তলোকে প্রস্থান করেন। সেই উপহারকে আশ্রয় করেই মহারাজ মেঘবাহন পত্নী বিয়োগের সান্ত্বনা খুঁজে বেড়ান। রাজকন্যা চম্পা এখন মহারাজের নয়ন-মণি। রাজ-কার্যের ফাঁকে ফাঁকে তিনি চলে আসেন অন্তঃপুরে। শিশুকন্যাটির দিকে চেয়ে থাকেন এক দৃষ্টিতে। উদ্বেলিত হৃদয়ের স্নেহপ্রবাহ উচ্ছ্বসিত অশ্রুবারিতে ঝরে পড়ে।

সেদিন সভাতে বসেছিলেন মহারাজ মেঘবাহন। অবসর খুঁজছিলেন অন্তঃপুরে যাবার। সহসা সম্মুখ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করলেন নগরাধিপ। মহারাজের উদ্দেশ্যে যথাবিহিত অভিবাদন জানিয়ে রাজকুমারী জীবার বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন।

প্রকাশ্য রাজসভাতে বিচারার্থিনী হলেও কোনো নারীর প্রবেশের নিয়ম ছিল না। সভা সংলগ্ন একটি কক্ষে পশ্চাৎ দ্বার দিয়ে নিয়ে যাওয়া হত বিচারা-র্থিনীকে। সেখানে দরজা আবৃত করে ঝুলত বংশ শলাকা নির্মিত চিক। উপবেশনের পর অন্তরাল থেকে উত্তর দেওয়ার রীতি ছিল।

মহারাজ মেঘবাহন সকল কথা শুনে ভিক্ষুণী জীবাকে অন্তঃপুরে নিয়ে যাবার আদেশ দিলেন। দৌবারিককে বললেন, ভিক্ষুণীর থাকার ব্যবস্থা যেন তাঁর ইচ্ছামত করা হয়। উপযুক্ত সময়ে তিনি ভিক্ষুণীকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

জীবা সপুত্র চলল রাজ অন্তঃপুরে। দৌবারিক পরিচারিকাদের হাতে জীবাকে সমর্পণ করে মহারাজের নির্দেশটি জানিয়ে দিল। পরিচারিকারা নবাগতা জীবাকে সসম্ভ্রমে নিয়ে চলল অন্তঃপুরের দক্ষিণ প্রস্থে। রানীমহলের একেবারে বিপরীত দিকে এই প্রস্থ। রাজগৃহে কোনো উৎসব উপলক্ষ্যে আত্মীয় সমাগম হলে মহিলারা ঐ প্রস্থটি অধিকার করে থাকেন। বর্তমানে কোনোরূপ উৎসব অনুষ্ঠান না থাকায় ঐ মহলটি শূন্য পড়েছিল।

জীবা ও তার পুত্রকে সবিনয়ে একটি বাসযোগ্য কক্ষ বেছে নিতে বলল পরিচারিকারা। জীবা নিম্নতলে অবস্থিত অতিক্ষুদ্র একটি কক্ষ তার অবস্থানের জন্য বেছে নিল।

অন্তঃপুরে জীবার আগমনের তৃতীয় দিনে মহারাজ মেঘবাহনের মনে পড়ল ভিক্ষুণী জীবার কথা। অমর্তপ্রভার মৃত্যুর পর তিনি কোনো নারীর প্রতি

সাধারণত দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন না। স্ত্রীর মৃত্যুর শোক, প্রায় চার বৎসর অতিক্রান্ত হলেও তিনি ভুলতে পারেননি।

রাজসভা থেকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করেই তিনি একদিন চম্পাকে দেখতে না পেয়ে, চম্পা, চম্পা বলে ডাক দিতে লাগলেন। অলিন্দ থেকে অন্তঃপুর-অঙ্গনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, চম্পা, মুণ্ডিতমস্তক একটি বালকের সঙ্গে খেলায় মত্ত হয়ে আছে। বালকটি কেবল সুদর্শনই নয় সহাস্য ও লাবণ্যময়।

তিনি পরিচারিকাকে প্রশ্ন করে জানতে পারলেন, বালকটি, সম্প্রতি আগত বিদেশিনী মহিলাটির সন্তান। অমনি মহারাজ মেঘবাহনের মনে হল ভিক্ষুণী এবং তার সোনার বুদ্ধমূর্তিটি সম্বন্ধে এখনও তিনি রাজা হিসেবে কোনো প্রশ্নাদি করেননি।

পরিচারিকাকে তিনি বললেন, অন্তঃপুরের সাক্ষাৎ কক্ষে ভিক্ষুণীকে নিয়ে এস। কক্ষের মধ্যবর্তী চিকগুলি ফেলে দাও।

প্রধানা পরিচারিকা সুরঙ্গিনী মহারানী অমর্তপ্রভার বড় প্রিয়পাত্রী ছিল। সেজন্য মহারাজ সুবঙ্গিনীকে অত্যন্ত সুনজরে দেখতেন। আর একমাত্র সরঙ্গিনীই মহারাজ মেঘবাহনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারত।

সুরঙ্গিনী বলল, মহারাজ, আমরা অতিথিকে উপযুক্ত কক্ষ দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি অতি ক্ষুদ্র নিম্নতলের সামান্য একটি কক্ষ অবস্থানের জন্য নির্বাচন করেছেন। তাছাড়া স্বপাকে নিরামিষ আহার করেন, তাও দিনান্তে একবার। শিশুপুত্রটিও এ ধরনের জীবন যাপনে অভ্যস্ত।

মেঘবাহন সস্মিত মুখে বললেন, আমি জানি সুরঙ্গিনী, তুমি থাকতে অতিথির কখনও অযত্ন হবে না।

একটু থেমে আবার বললেন, ভিক্ষুণীব বালক পুত্রটিকে চম্পার সঙ্গে খেলা করতে দেখলাম। মনে হল চম্পা বালকটিকে খেলার সঙ্গী হিসেবে পেয়ে খুবই খুশী হয়েছে।

মহারাজ, আপনার অনুমান যথার্থ। সারাদিন চম্পা অতিথি মহলে থাকতেই ভালবাসে। ওর যথাসময়ে স্নান আহার করানো এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মেঘবাহন বললেন, আহা, মা হারা মেয়ে, ও যাতে এতটুকু আনন্দ পায় তাতেই আমি খুশী।

সুরঙ্গিনী বলল, মহারাজ, ঐ ভিক্ষুণী ইতিমধ্যেই চম্পাকে কতকগুলি স্তোত্র সুর করে গাইতে শিখিয়েছেন। চম্পার গলায ঐ স্তোত্র শুনলে আপনি মুগ্ধ হয়ে যাবেন।

আচ্ছা, চম্পাকে একবার আমার কাছে নিয়ে এস তো। আমি ওর গান শুনব।

একটু কি ভেবে নিয়ে বললেন, আচ্ছা থাক্, ওরা দুজনে খেলছে খেলুক। তুমি বরং ভিক্ষুণীকে সাক্ষাৎ-কক্ষে নিয়ে এস।

চিকের অন্তরালে এসে বসেছে জীবা। মহারাজ এপারে বসেছেন একটি আরাম কেদারায়।

মহারাজ মেঘবাহন কথা শুরু করলেন, অতিথিশালায় আপনার কোনো অসুবিধে হয়নি তো?

জীবা বলল, অযাচিতভাবে আপনার এত অনুগ্রহ লাভ করে আমার সংকোচের শেষ নেই মহারাজ।

এটা আমার কর্তব্য বলেই জানবেন। আচ্ছা, আমি অত্যন্ত বিস্মিত হচ্ছি আপনার মুখে বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ শুনে। সেদিন নগরাধিপের বিবরণ থেকে জেনেছিলাম, আপনি সুদূর কুচীদেশবাসিনী। বৌদ্ধধর্ম বহু পূর্ব থেকেই ওসব দেশে ছড়িয়ে পড়েছে জানতাম, কিন্তু সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন ওসব অঞ্চলে যে এমন ভাবে হয়েছে তা আমার জ্ঞানের বাইরে ছিল।

মহারাজ, কুচীদেশবাসীরা কিন্তু সংস্কৃতের অনুশীলন করে না।

তাহলে আপনি শিখলেন কি করে?

আমার স্বামীর কাছ থেকে।

তিনিও তো কুচীদেশের অধিবাসী, তিনি শিখলেন কি করে?

না মহারাজ, আমার স্বামী ছিলেন এই ভারতবর্ষেরই মানুষ। তিনি অতিশয় বিদ্বান ও সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান ছিলেন। তক্ষশীলা ছিল তাঁর শিক্ষাক্ষেত্র। একসময় তিনি গৃহত্যাগ করে বণিক দলের সঙ্গে কুচীর দিকে যাত্রা করেন। অনেক বাধা-বিঘ্নের ভেতর দিয়ে যাত্রা করে তিনি অবশেষে কুচীর রাজগৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানেই আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও বিবাহ।

মহারাজ বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, যথার্থই এ এক স্মরণীয় ঘটনা। সুদূর কুচী রাজ্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্পর্ক!

একটু থেমে আবার বললেন, আপনার কথা থেকে অনুমান, তিনি আর জীবিত নেই।

সঠিক অনুমান মহারাজ। তাঁর মৃত্যুর পরে আমি সর্বতাপহর, শান্তিময় প্রভুর চরণে আশ্রয় নিয়েছি।

সেই মুহূর্তে সহসা মহারাজ মেঘবাহনের অমর্তপ্রভার কথা মনে পড়ল। তাঁর হৃদয় অকস্মাৎ পত্নী-বিরহ ব্যথায় আর্দ্র হয়ে উঠল।

মহারাজ বললেন, এখন বলুন, আপনাকে আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারি?

জীবা সবিনয়ে বলল, মহারাজ, আপনার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে আপনার আশ্রয় না পেলে আমার বিপর্যয়ের শেষ থাকত না। তবে অনুগ্রহ করে যখন সাহায্যের কথা তুললেন তখন বলি, রাজগৃহ থেকে দূরে কোনো নির্জন স্থানে আমার থাকার যদি একটু ব্যবস্থা করে দেন, তাহলে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

মহারাজ বললেন, দুটি দিন প্রাসাদে অবস্থান করুন, এরই মধ্যে আপনার ইচ্ছানুযায়ী ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

সামান্য সময় নীরবতার পর জীবা বলল, মহারাজ, এখনও আমার বিচার স্থগিত রয়েছে।

সে কি! কিসের বিচার?

নগরাধিপ যে কারণে আমাকে আপনার বিচার সভায় উপস্থিত করেছিলেন। সেই সোনার বুদ্ধমূর্তিটি প্রসঙ্গে।

মহারাজ সস্মিত মুখে বললেন, সে বিচারের নিষ্পত্তি অনেক আগেই হয়ে গেছে। কুচীর রাজকন্যা বুদ্ধমূর্তি অপহরণ করবেন, এ কি বিশ্বাসযোগ্য।

মহারাজ, আপনি যেভাবে কুচীর রাজদুহিতার মর্যাদা রক্ষা করলেন তাতে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার নেই।

প্রাসাদ থেকে কিছু দূরে পর্বতের কোলে নির্জন উদ্যান। একটি নৃত্যশীলা ঝর্ণা পাহাড়ের মসৃণ শিলাখণ্ডে নূপুরের নিক্কণ তুলে নেমে আসতে আসতে একেবারে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে একটি পাহাড়ী নদীতে। স্থানটির প্রাকৃতিক শোভা যেমন মনোরম তেমনি প্রকৃতির দ্বারাই সে সুরক্ষিত। এক ধরনের মৃগ ও শশক জাতীয় প্রাণী সেই উদ্যানের শোভা বর্ধন করছে। স্থানে স্থানে ফলকর বৃক্ষের সমাবেশ। মহারাজ মেঘবাহন এখানে একটি পর্ণকুটির নির্মাণ করে রেখেছেন। রাজকার্যে ক্লান্তি এলে কয়েকটি দিনের জন্য তিনি প্রাসাদ ছেড়ে চলে আসেন এই নির্জন নিবাসে। পাখির কাকলি, মৃগের লীলায়িত উল্লম্ফন, ঝর্ণার গান, মেঘের সঞ্চরণ তাঁর মনের মধ্যে জমে ওঠা ক্লান্তিকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

এই উদ্যান বাটিকাটি তিনি ভিক্ষুণী জীবার অবস্থানের জন্য নির্বাচন করে নৌকো যোগে সপুত্র জীবাকে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। কেবলমাত্র বৃদ্ধ উদ্যান-রক্ষক রইল মাতাপুত্রের দেখাশোনার ভার নিয়ে।

এই শান্ত প্রকৃতির কোলে গাছের ছায়ায়, তৃণের সজ্জায় দেহ এলিয়ে শুয়ে থাকে জীবা। যেমন সন্তান শুয়ে থাকে জননীর বুকে পরম শান্তিতে। ঝর্ণার জলে স্নান সেরে চীনপট্টে দেহ আবৃত করে জীবা বসে থাকে পূর্বমুখী হয়ে। মনে মনে স্মরণ করতে থাকে প্রভু তথাগতকে। সহসা পর্বত শীর্ষে জ্যোতির্ময় সূর্যের আবির্ভাব হয়। ধীরে ধীরে আলোর বন্যায় ভেসে যায় অরণ্য, নদী, প্রান্তর। আকাশের বুকে পাখা মেলে হংস বলাকা উড়ে যায় কোনো পদ্মে ভরা সরসী লক্ষ্য করে।

জীবার চোখ ভরে আসে জলে। দুটি গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে সে অশ্রু।

দূরে অরণ্য বৃক্ষের আলোছায়ায় বৃদ্ধ উদ্যানরক্ষকের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় কুমারজীব। প্রকৃতির গাছপালা পশুপাখির সঙ্গে নিবিড় পরিচয় ঘটে তার।

বৃদ্ধ উদ্যানরক্ষক কৌতূহলী বালকটির প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে স্নেহে বিগলিত হয়ে যায়।

এদের দেখলে বাল্মীকির তপোবনের ছবি চোখের ওপর ফুটে ওঠে।

জীবা ভাবে, দুঃখের কত দুর্গম পথ তাকে পার হয়ে আসতে হয়েছে। স্বামীর অকাল মৃত্যুর দুঃখ বুকে নিয়ে শিশু পুত্রটিকে সঙ্গী করে কত অচেনা অজানা পথ সে পার হয়ে এসেছে। ভবিষ্যতের একটি স্বপ্ন ধ্রুব নক্ষত্রের মত তাকে পথ দেখিয়ে টেনে এনেছে সুদূর ভারতভূমিতে। তার পুত্র এই মহান ভারতের বুকে শিক্ষালাভ করে উঠবে বিশ্ববরেণ্য।

সহসা জীবার ভাবনার পথ বেয়ে এসে দাঁড়ান মহারাজ মেঘবাহন। কৃতজ্ঞতায় নত হয়ে আসে জীবার মস্তক। মস্তক ঝড়ঝঞ্ঝা বিপর্যয়ের মাঝে তার মনে হয় মেঘবাহন প্রসারিত করে রেখেছেন তাঁর অভয় হস্তখানি।

সপ্তাহ অন্তে রাজগৃহ থেকে নৌকো এল। খাদ্য দ্রব্যাদি নিয়ে। জীবা দেখল তার প্রয়োজনের তুলনায় আয়োজন অনেক বেশী। সে পত্রযোগে রাজাকে জানাল, মহারাজ, আমি ভিক্ষুণী। দিনান্তে একবারমাত্র আহার্য গ্রহণ করি। আপনার প্রেরিত সাপ্তাহিক খাদ্যসম্ভার আমার ভাণ্ডারে উদ্বৃত্ত হয়ে যায়। অপচয় আমাকে পীড়িত করে। অথচ আপনার প্রীতির দানকে আমি ফিরিয়ে দিই এমন ধৃষ্টতা আমার নেই। অনুগ্রহ করে মাসান্তে সম পরিমাণ খাদ্য পাঠিয়ে আমাকে মানসিক বেদনার হাত থেকে নিষ্কৃতি দিন।

পত্রপ্রাপ্তির একমাস পরে রাজগৃহ থেকে খাদ্যসম্ভার নিয়ে নৌকো এল। সুভদ্র পোশাকে সজ্জিত রাজার নৌ-চালক নৌকো বাঁধল উদ্যানের ঘাটে।

একটি একটি করে প্রয়োজনীয় সামগ্রী এনে তুলল উদ্যান বাটিকায়। কাজ শেষ হলে জীবা একটি পাত্রে কিছু ফল মিষ্টান্ন এনে নৌ-চালককে খেতে দিয়ে বলল, বহুপথ অতিক্রম করে আপনি নিশ্চয়ই ক্লান্ত। সামান্য কিছু গ্রহণ করলে তৃপ্ত হব।

কৃতজ্ঞতার হাসি ফুটে উঠল নৌ-চালকের মুখে। সে জীবার প্রদত্ত পাত্র থেকে আহার্য গ্রহণ করে পরিতৃপ্তির সঙ্গে ভোজন করতে লাগল।

ভোজনের অবকাশে বাক্যালাপ চলছিল জীবা আর নৌ-চালকের মধ্যে।

জীবা বলল, আপনি এই উদ্যান বাটিকায় এর আগে নিশ্চয়ই নৌকো নিয়ে এসেছেন।

মহারাজকে কতবার আমিই তো এখানে নৌকো করে এনেছি।

আপনি কি কেবল মহারাজেরই নৌকো চালনা করেন?

আপনার অনুমান সত্য। তবে মহারাজের সঙ্গে আমার আরও একটি সম্পর্ক আছে। আমরা একসময় সহপাঠী ছিলাম। গুরু মাধবস্বামীর পাঠশালায় শৈশবে একই সঙ্গে পাঠ গ্রহণ করেছি। পরে সিংহাসনে আরোহণ করে মেঘবাহন

আমার ইচ্ছা অনুযায়ী নৌ-চালনার ভারটি আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, মরুদ্‌বাহন, শৈশবে যেমন তুমি আমার বন্ধু ছিলে আজও ঠিক তেমনি রইলে।

আমি বললাম, সে কি করে হয় মহারাজ!

তখন মেঘবাহন আমাকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, মরুদ্‌বাহন, তুমি আমার সঙ্গে প্রভুর সম্মান দেখিয়ে কথা বলতে এলে আমিও জেনো সিংহাসন থেকে সরে দাঁড়াব।

জীবা অভিভূত হয়ে বলল, আশ্চর্য মহানুভব আপনাদের মহারাজ।

আপনি এইমাত্র মহারাজকে যে বিশেষণে ভূষিত করলেন তা একমাত্র মেঘবাহন ছাড়া অন্য সকলেই সমর্থন করবে।

আপনার বন্ধু বুঝি প্রশংসায় সংকোচ বোধ করেন?

তিনি আমার বন্ধু আবার তিনি আমার প্রভুও। অন্যেরা আমাকে তাঁর সেবক বলুক, এটাই আমি চাই। কেবল তিনি আমাকে যখন বন্ধু বলে বুকে স্থান দেন তখনই আমি বুঝতে পারি, আমরা এক আত্মা, অভিন্ন হৃদয়।

জীবা অনুভব করল, এই নৌ-চালক সামান্য কেউ নন, অসামান্য এঁর অনুভূতি। গুরু মাধবস্বামীর শিক্ষা এঁদের চরিত্র গঠনে নিশ্চয়ই প্রভূত সাহায্য করেছে।

সঙ্গে সঙ্গে জীবার মনে উদিত হল আপন সন্তানের শিক্ষা প্রসঙ্গ। কুমারজীবের জন্য এমন গুরুর প্রয়োজন যিনি কেবলমাত্র তাকে শাস্ত্রীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবেন না, চরিত্র গঠনে, মনের ঔদার্য বিকাশে সাহায্য করবেন।

জীবা বলল, আজ আপনার সঙ্গে কথা বলে প্রভূত আনন্দ পেলাম। আপনি যদি এই নদীপথে কখনও কোনো কর্মান্তরে যান তাহলে অনুগ্রহ করে এই উদ্যান বাটিকায় অবতরণ করলে গভীর তৃপ্তি লাভ করব।

আপনার আমন্ত্রণের কথা আমি ভুলব না।

আহারান্তে জীবার কাছে বিদায় নিয়ে নৌ-চালক প্রস্থান করল।

একদিন স্বয়ং মহারাজ মেঘবাহন এলেন উদ্যান বাটিকায়। সেদিন বুদ্ধের জন্মান্তরের কাহিনীগুলি পুত্রকে শোনাচ্ছিল জীবা। হিরন্ময় রৌদ্রে স্নাত হচ্ছিল সপত্র বৃক্ষরাজি। ধরণীর বুকে উদ্গত তৃণেও প্রবাহিত হচ্ছিল সেই আলোর তরঙ্গ।

জীবা শোনাচ্ছিল বারাণসীরাজ আর কোশলরাজের কাহিনী। তন্গত হয়ে সে কাহিনী শুনছিল কুমারজীব। বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়িয়ে আর একজন নিঃশব্দে অনুভব করছিলেন সে কাহিনীর সত্য।

দুই রাজার যশোগানে চতুর্দিক মুখরিত। নগরবাসীদের কারোর কণ্ঠেই শোনা যায় না মহারাজাদের নিন্দাবাদ। এতে খুশী হবারই কথা, কিন্তু তাঁদের

দুজনের কেউই খুশী হতে পারলেন না। ছদ্মবেশে তাঁরা তখন নিজ নিজ রাজ্য থেকে রথারোহণে বেরিয়ে পড়লেন জনপদ পরিক্রমায়। যদি কিছু ত্রুটি ধরা পড়ে তাহলে তা সংশোধন করে নেবেন। নিজ নিজ চরিত্রকে আরও শুদ্ধ. আরও উজ্জ্বল করে তুলবেন।

ভাগ্যের এমনি পরিহাস যে জনপদেও তারা কারোর মুখে কোনো নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন না।

এবার প্রত্যাবর্তনের পালা। যে যার রাজ্যের দিকে ফিরে চলেছিলেন বিষণ্ণ মনে। হঠাৎ একটি সংকীর্ণ পথে মুখোমুখি হল দুটি রথ।

কোশলরাজের সারথি হেঁকে বলল, রথ ফেরাও, পথ ছাড়। দেখছ না, কোশলরাজ মল্লিক রয়েছেন আমার রথে।

সহাস্যে বারাণসীরাজের সারথি বলল, তুমি বোধহয় জান না। আমার রথে কে রয়েছেন। সর্ব গুণান্বিত বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত।

কোশলরাজের সারথিও হটবার পাত্র নয়। সে অমনি বলল, তাহলে গুণ মান, বিষয়-সম্পদের বিচার হোক। যিনি অন্যের চেয়ে ছোট হবেন তিনিই পথ ছাড়বেন।

রাজি হয়ে গেল বারাণসীরাজের সারথি। অমনি একে একে চলল উত্তর প্রত্যুত্তর। কিন্তু কি আশ্চর্য! উভয়ের রাজ্যের আয়তন, সম্পদ, সৈন্যবল, এমন কি বয়ঃক্রমও এক। তাহলে কে বড় কে ছোট তার বিচার হবে কি করে!

বারাণসীরাজের সারথি তখন বলল, যিনি চরিত্র গুণে মহত্তর তাঁকেই ছেড়ে দিতে হবে পথ। এখন বল তোমাদের রাজার চরিত্রমাহাত্ম্য?

কোশলরাজের সারথি বলল, তবে শোন আমাদের মহারাজের চরিত্র-কথা। যিনি কঠোর তাঁর সঙ্গে তিনি কঠোর ব্যবহার করেন। কোমল স্বভাব যাঁর তাঁর সঙ্গে করেন কোমল ব্যবহার। সাধুজনের কাছে তিনি পরম সাধু, আর শঠকে শিক্ষা দেন শঠতার দ্বারা। এখন বল, তোমাদের মহারাজের গুণপনা।

হেসে বলল বারাণসীরাজের সারথি, আমাদের মহারাজ কিন্তু ভাই ওভাবে মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করেন না। তিনি ক্রোধী মানুষকে জয় করেন শান্ত ব্যবহারের দ্বারা। সাধু ব্যবহারে তিনি দূর করেন অসাধুর সকল দোষ। দানের দ্বারা তিনি কৃপণের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটান। আর সত্যকে আশ্রয় করে তিনি সরিয়ে দেন মিথ্যার আবরণ।

এইখানে গল্পে ছেদ টেনে দিয়ে জীবা বলল, এখন বলতো, এই দুই রাজার মধ্যে কে বড়?

কুমারজীব মায়ের মুখের দিকে চেয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলল, বারাণসীরাজ মা। কোশলরাজকেই ফিরিয়ে নিতে হবে তাঁর রথ।

সাধু! সাধু!

জীবা আর কুমারজীর শব্দ লক্ষ্য করে একই সঙ্গে পার্শ্ববর্তী অরণ্যের দিকে

ফিরে তাকাল। বৃক্ষের অন্তরাল থেকে কুমারজীবকে সাধুবাদ জানাতে জানাতে সামনে এসে দাঁড়ালেন মহারাজ মেঘবাহন।

মাতা পুত্র ততক্ষণে একই সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছে।

জীবার কণ্ঠে বিস্ময়, মহারাজ! আজ কি সৌভাগ্য আমার।

আমারও কম ভাগ্য নয়। কোশল আর বারাণসীরাজের কাহিনী শুনলাম আপনার কণ্ঠে। তারপর 'কে বড়' তার সমাধানও করে দিল আপনার প্রতিভাধর পুত্র কুমারজীব।

জীবা সহসা কোনো কথা বলতে পারল না। সে সঙ্কোচে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইল। পরক্ষণেই সচেতন হয়ে ছুটল কুটিরের অভ্যন্তরে। আসন এনে বিছিয়ে দিল ছায়াতরুর তলায় তৃণভূমিতে।

রাজা আসন গ্রহণ করলে মাতা পুত্র অদূরে তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরে উপবেশন করল।

মহারাজকে এই প্রথম সম্পূর্ণ মূর্তিতে দেখল জীবা। রাজগৃহে চিকের অন্তরাল থেকে স্পষ্ট দেখা যায়নি যাঁকে তিনি আজ সমস্ত আবরণ সরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রান্তরে।

জীবা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করছিল, মহারাজ মেঘবাহনের সঙ্গে কি নিবিড় সাদৃশ্য আর একজনের। সেই প্রশস্ত উন্নত ললাট, সুগঠিত নাসিকা, আয়ত চক্ষু, বলিষ্ঠ পৌরুষ-দীপ্ত মূর্তি। কুমারায়ণ! হ্যাঁ কুমারায়ণই যেন রাজা মেঘবাহণের পোশাক পরে বসে রয়েছে জীবার মুগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টির সামনে।

মুহূর্তে মোহভঙ্গ হল রাজার কণ্ঠস্বরে। মহারাজ মেঘবাহন বললেন, রাজগৃহ থেকে আপনার চলে আসার পর একজন হারিয়েছে তার সবচেয়ে প্রিয় বস্তুকে।

চমকে উঠল জীবা। কার কথা বলতে চাইছেন মহারাজ মেঘবাহন! কে সেই একজন! আর তার প্রিয় বস্তুটিই বা কি!

জীবা সুভদ্র হাসি হেসে রাজার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল। রাজা নিজেই কুহেলিকা সরিয়ে আসল কথাটি পাড়লেন, কুমারজীবের চলে আসার পর চম্পা তার খেলার সাথীকে হারিয়ে বড় আনমনা হয়ে পড়েছে।

জীবা অমনি বলে উঠল, কেমন আছে চম্পা? তাকে সঙ্গে আনলে এখানে দুদণ্ড খেলতে পেয়ে খুব খুশী হত সে।

মহারাজ মৃদু হেসে বললেন, ইচ্ছে করেই আনিনি তাকে। এখানে একবার এলে সে আর ফিরে যেতে চাইবে না। আপনিও নিশ্চয়ই চাইবেন না, একটি কন্যা তার বাবার চোখের আড়ালে থাকুক।

না মহারাজ।

জানি না, আপনার ভেতর কি যাদু আছে। এখনও সে আপনার কথা ভুলতে পারেনি। প্রতি সন্ধ্যায় ঘুমের কোলে ঢলে পড়ার আগে আপনার মুখে গল্প

শোনার জন্য উতলা হয়।

চম্পার জন্য আমারও কষ্ট হয় মহারাজ। সেও কুমারজীবের মত আমার এক সন্তান। মাতৃহারা মেয়েটি ক'দিনের ভেতরই আমার বুকের মধ্যে তার ঠাঁই করে নিয়েছে।

মহারাজ কিছুক্ষণ নীল শৈল সংলগ্ন একখণ্ড মেঘের দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর মনে হল, মেঘখণ্ডটি তার উপযুক্ত আশ্রয়ই নির্বাচন করে নিয়েছে।

এবার মহারাজ জীবার দিকে তাকিয়ে ভিন্ন কথার অবতারণা করলেন, আপনি কুমারজীবের অধ্যয়নের বিষয়ে কিছু ভেবেছেন কি?

জীবা বলল, বহু আশা নিয়ে আমি কুমারজীবের পিতৃভূমিতে এসেছি মহারাজ। তিনি ছিলেন তক্ষশীলার অন্যতম কৃতবিদ্য ছাত্র। আমি সেই বহুবিদিত বিশ্ববিদ্যালয়ে কুমারজীবকে যথার্থ শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে চাই।

মহারাজ বললেন, নিশ্চয়ই আপনার ইচ্ছে একদিন পূর্ণ হবে। কিন্তু বিদ্যার্থী ষোড়শ বর্ষে প্রবেশ না করলে তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার পাবে না।

জীবার আশাভঙ্গের ম্লান ছায়া ঘনিয়ে উঠল। সে বলল, যদি কেউ তার যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারে, তাহলেও কি শিথিল হবে না নিয়মের বাঁধন?

মহারাজ বললেন, তক্ষশীলার ঐ এক নিয়ম। আজ আটশত বৎসরেরও অধিককাল ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়নি।

সামান্য সময় কি যেন চিন্তা করে নিয়ে আবাব বললেন, আমারই রাজ্যের একেবারে প্রান্তসীমায় থাকেন মাধবস্বামী। তিনি আমার গুরু ছিলেন। বড় বিচিত্র জীবন তাঁর।

সেই মুহূর্তে জীবার মনে পড়ল এই গুরু মাধবস্বামীর প্রসঙ্গ সে নৌচালকের মুখেও শুনেছে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকের মত তার চিন্তায় প্রতিভাত হল, মহারাজ এবং সেদিনের সেই নৌচালকের কণ্ঠস্বর, বাগ্‌ভঙ্গীর মধ্যে কি আশ্চর্য মিল!

পরক্ষণেই মহারাজের কথার সূত্রে সে ফিরে গিয়ে বলল, সে কি রকম মহাবাজ?

মেঘবাহন বললেন, তাঁর জীবনে বৈচিত্র্যের শেষ নেই। আজ কেবল তাঁর শিক্ষাজীবনের কথাটুকুই আপনাকে শোনাই।

জীবা সাগ্রহে মহারাজ মেঘবাহনের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

মাধবস্বামী তক্ষশীলারই ছাত্র ছিলেন। তিনি প্রায় সর্ববিদ্যা বিশারদ। চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁর খ্যাতি সারা রাজ্যে সুবিদিত। অস্ত্রবিদ্যায় তাঁর নৈপুণ্য যে কোনো সৈন্যাধ্যক্ষকে লজ্জা দিতে পারে। তাছাড়া হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনে তাঁর ব্যুৎপত্তি প্রশ্নাতীত।

জীবা সোচ্ছ্বাসে বলল, আশ্চর্য প্রতিভাধর!

রাজা বললেন, সেই কৃতি পুরুষটি পাঠসমাপনান্তে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান আচার্যকে প্রণাম করে দাঁড়ালেন তখন আচার্য বললেন, মাধব, তুমি গুরু-কুলের মুখ উজ্জ্বল করেছো, এখন যে কোনো একটি বিষয়ে অধ্যাপনার ভার গ্রহণ কর।

মাধবস্বামী সবিনয়ে বললেন, আচার্যদেব, আমার অধীত বিদ্যার ফল সর্ব-সাধারণে লাভ করুক, এই আমার মনের বাসনা। আপনি আশীর্বাদ করুন, জনপদে থেকে যেন চিরদিন মানুষের সেবা করে যেতে পারি।

জীবা অভিভূত হয়ে বলল, এমন গুরুর চরণে আপনিই মাথা নত হয়ে আসে।

মহারাজ বললেন, আমার পিতৃদেব বহু সম্মান দেখিয়ে গুরুমাধবস্বামীকে এ রাজ্যে নিয়ে আসেন। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী একটি আশ্রমে তাঁর অবস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। পরে আমার গুরুদক্ষিণা হিসেবে পিতৃদেব মাধবস্বামীকে সম্পূর্ণ আশ্রমটি দান করেন। দীর্ঘকাল গুরুদেব ঐ আশ্রমে থেকে বহু জনপদবাসীকে বিদ্যা দান করেছেন। এখন বার্ধক্যে কেবল আর্ত, রোগগ্রস্তের চিকিৎসায় সময় অতিবাহিত করেন।

মহারাজ, গুরু মাধবস্বামীর কাছে আমার কুমারজীবের পাঠগ্রহণ কি সম্ভব?

আজ আমার এখানে আসার প্রধান উদ্দেশ্য কিন্তু তাই। কেবল কুমারজীব নয়, আমি আমার কন্যার শিক্ষার কথাও ভেবেছি। গুরু রাজী হলে প্রতিদিন প্রভাতে রাজগৃহ থেকে নৌকো আসবে চম্পাকে নিয়ে। পথে এই উদ্যান বাটিকায় নৌকো থামিয়ে তুলে নেওয়া হবে কুমারজীবকে। দুজনে সারাদিন গুরুগৃহে বিদ্যাভ্যাস করে সন্ধ্যায় ফিরে আসবে ঐ নৌকোয়।

জীবা অভিভূত হয়ে বলল, আপনার করুণার ঋণ কোনোদিনই পরিশোধ করতে পারব না মহারাজ। শুধু অনুরোধ, রাজকার্যে অবসর পেলে এই উদ্যান বাটিকার কথা যেন আপনার স্মরণে আসে।

মহারাজ বললেন, আপনার আমন্ত্রণের কথা আমি ভুলব না।

মেঘবাহন নৌকো নিয়ে রাজপুরীর দিকে অগ্রসর হলেন। নদীর কূলে দাঁড়িয়ে জীবার মুখে ফুটে উঠল একটুকরো হাসি। মহারাজের ছদ্মবেশ খসে পড়ল তার চোখের সামনে। বিদায় মুহূর্তে মহারাজের শেষ কথাটি সেদিনের নৌচালকের শেষ কথার অবিকল প্রতিধ্বনি হয়ে বাজতে লাগল, 'আপনার আমন্ত্রণের কথা আমি ভুলব না।'

দুই

মহারাজ মেঘবাহন চম্পা আর কুমারজীবের সঙ্গে গুরুর চরণবন্দনা করে উঠে দাঁড়াতেই মাধবস্বামী রাজার মুখের ওপর প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করে বললেন, বহুদিন পরে তোমাকে আশ্রমে দেখে বড় আনন্দ পেলাম মেঘবাহন।

রাজা বললেন, আচার্যদেব পক্ষকালও অতীত হয়নি, আমি আপনার চরণবন্দনা করে গেছি।

পক্ষকাল প্রিয়জনের অদর্শন এক যুগের ব্যবধান বলে মনে হয়।

আবার প্রসন্ন হাসিতে মুখখানিকে উদ্ভাসিত করে বললেন, মহারাজ মেঘবাহন, এখন বল, এই শিশু চারাগাছ দুটিকে সঙ্গে নিয়ে এখানে আগমনের হেতু? বৃদ্ধের নয়নরঞ্জন আর হৃদয়হরণের জন্য কি?

আচার্যদেব, এই চারাদুটি আপনার স্নেহস্পর্শে সংবর্ধিত হতে চায়।

বড় অসময়ে নিয়ে এলে মেঘবাহন। চারাগাছগুলি পুষ্পিত হবার কাল পর্যন্ত কি ইহলোকে বিধাতা আমাকে অবস্থানের সুযোগ দেবেন?

আমি সেই বিশ্বাস নিয়েই তো আপনার কাছে এদের এনেছি গুরুদেব।

তথাস্তু। তোমার শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হোক। তবে মেঘবাহন, আশ্রমের অধ্যক্ষের জীর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমটিও স্বাভাবিক কারণে জীর্ণ হয়ে পড়েছে। এর ভেতর ঐ শিশুদের পরিচর্যার ভার নেওয়া কি সম্ভব হবে?

প্রতিদিন প্রভাতে বিদ্যার্থীদের আপনার আশ্রমে পৌঁছে দিয়ে যাব, সন্ধ্যা-কালে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাব এদের। সারাদিন এরা প্রকৃতির মাঝে থেকে আপনার পাঠ গ্রহণ করবে। আমি রাজগৃহ থেকে আশ্রমের উদ্যান সংস্কারের জন্য অবিলম্বে কয়েকজন পরিচর্যাকারীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

হাঁ, আর একটি কথা।

বলুন গুরুদেব।

তুমি তো বাক্‌কে জান, যে আমার কাছে প্রতিপালিত হচ্ছে। সে তোমার কন্যার সঙ্গী হতে পারবে।

এতো চম্পার মস্ত বড় লাভ গুরুদেব।

আরও একটি কথা তোমাকে জানাবার আছে।

বলুন।

বিতস্তার ওপারে রাজা অমিতবীর্যকে তুমি জান। সেই অমিতবীর্য তার অষ্টমবর্ষীয় পুত্র বিক্রমকেশরীর শিক্ষার ভার আমার ওপর অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হতে চায়। আমি জানি, তোমাদের রাজপরিবারের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক মধুর

নয়। এ ক্ষেত্রে তোমার কি অভিমত তা আমাকে স্পষ্ট করে জানাও।

আপনি জানেন গুরুদেব, এককালে ওরা ছিল আমাদের নামমাত্র করদ-মিত্র রাজ্য। পিতৃদেবের সময়ে অমিতবীর্যের পিতা আমাদের কর দান বন্ধ করে বন্ধুত্বের বন্ধন ছিন্ন করে। সেই থেকে তিক্ত না হলেও সম্পর্ক মধুর নয়।

তাহলে তুমি নিশ্চয়ই চাইবে আমি বিক্রমকেশরীর শিক্ষার ভার গ্রহণ না করি।

তা কেন চাইব গুরুদেব। যথার্থ শিক্ষকের কাছে ধনী নির্ধন, শত্রুমিত্রের কোনো ভেদাভেদ নেই।

বড় তৃপ্ত হলাম তোমার কথায় মেঘবাহন। তোমার ক্ষেত্রে আমার শিক্ষা যে ব্যর্থ হয়নি তা জেনে আজ আমার শিক্ষক জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কারটি পেয়ে গেলাম।

এরপর গুরু মাধবস্বামী চম্পার দিকে চেয়ে বললেন, কই গো, আমার ফুল কই ?

চম্পা অসংকোচে বলল, এই যে ফুল, এই তো আমি এসেছি।

এটি গুরু মাধবস্বামী আর চম্পার অনেকদিনের উত্তর প্রত্যুত্তর। পিতার সঙ্গে চম্পা এ আশ্রমে প্রায়ই এসে থাকে। তাই মাধবস্বামীর সঙ্গে তার ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে এক মধুর সম্পর্ক।

এবার মেঘবাহন কুমারজীবকে গুরুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য সামনে নিয়ে এলেন। আনুপূর্বিক বর্ণনা করে গেলেন, কুমারায়ণ আর জীবার কাহিনী। শেষে বললেন, গুরুদেব, হয়তো এই বালকটির ভেতরেই আপনি খুঁজে পাবেন আপনার এতকালের শিক্ষকতা জীবনের শ্রেষ্ঠ ছাত্রটিকে।

গুরু মাধবস্বামী কুমারজীবের পবিত্র বিদ্যা-বিনত মুখখানির দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, জন্মান্তরের সংস্কার আছে এর ললাটে। একদিন রাজ রাজেশ্বর হতে পারে এ বালক।

আশ্রমে ফুল, লতাপাতা, পাখির সঙ্গে বিদ্যার্থীদের হল প্রথম প্রণয়। প্রকৃতি-পাঠ থেকে শুরু হল তাদের বিদ্যাচর্চা। চারটি তাজা প্রাণের স্পর্শে মাধবস্বামীর দেহ থেকে জরা নিল বিদায়। তিনি সহসা প্রদীপ্ত হয়ে উঠলেন।

রাজা অমিতবীর্যের পুত্র বিক্রমকেশরী প্রকৃতিতে চারজনের ভেতর ছিল দুর্দান্ত। তার বাক্য ছিল বলদৃপ্ত, আচরণ ছিল শক্তিমান সৈনিকের মত। গুরু মাধবস্বামী নিপুণ ছিলেন অসিচালনা আর শরসন্ধানে। তিনি বিক্রমকেশরীর প্রবণতা অনুযায়ী তাকে নতুন নতুন অস্ত্রশিক্ষার পাঠ দিতে লাগলেন। রাজ-নীতির পাঠক্রমেও সে ছিল বিশেষ আগ্রহী।

অন্যদিকে সমবয়সী দুই সখির পঠনপাঠনের চেয়ে আশ্রমের তরু অন্তরালে ঘুরে বেড়ানোতেই ছিল বিশেষ আগ্রহ। প্রজাপতির পেছনে ধাওয়া করা, ফলের জন্য বিশেষ বিশেষ তরুতলে সন্ধান, এই ছিল দুই সখির নিত্যকর্ম।

মাধবস্বামী দুই কন্যাকে মাঝে মাঝে আশ্রমের কাজে নিযুক্ত করে রাখতেন।

পরিবেশকে কিভাবে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রাখা যায় সে শিক্ষা দিতেন। অবসর সময়ে বহু মনোরঞ্জক ও শিক্ষাপ্রদ গল্প শোনাতেন।

গুরু মাধবস্বামী লক্ষ্য করতেন, দুই সখির প্রকৃতিতে কিছু ভিন্নতা আছে। বাক্, চঞ্চল আর চম্পা, গভীর। রাজকন্যার আচরণের ভেতর সামান্যতম ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেত না, প্রকাশিত হত তৃপ্তিদায়ক মধুরতা। অপরদিকে বাকের চঞ্চলতা ছিল উপভোগ্য। সে সারাক্ষণ নানা কাজের ভেতর নিজেকে ছড়িয়ে জড়িয়ে রাখতে ভালবাসত।

কুমারজীব ছিল এদের মধ্যে স্বতন্ত্র। তার নিষ্ঠা, শ্রম, আগ্রহ গুরু মাধবস্বামীকে সারাক্ষণ আকৃষ্ট করে রাখত। হিন্দু এবং বৌদ্ধ দর্শনের মূল বিষয়গুলি কুমারজীবের আয়ত্ব করতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হত না। ছাত্রের গভীর আগ্রহ এবং বোধশক্তি উদ্দীপ্ত করত গুরুকে। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে, স্থূল থেকে সূক্ষ্ম তিনি বিচরণ করতেন প্রতিভাধর ছাত্রকে নিয়ে।

প্রতিটি বিষয়েই ছিল কুমারজীবের একাগ্রতা। শিক্ষার পঞ্চম বর্ষে একদিন দুই সখিতে কুমারজীব আর বিক্রমকেশরীকে টেনে নিয়ে গেল বনের মধ্যে। বিশাল একটি শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট বৃক্ষের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখাল একটি স্বর্ণ বর্ণের ফল। ডালের আড়ালে ফলের বৃন্তটি প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে। ঐ ফলটি শরাঘাতে ভূপাতিত করার চেষ্টা করলেই ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যেতে পারে। এখন সামান্য মাত্র যেটুকু বৃন্ত দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল কেবল সেই স্থানটিতে আঘাত করলেই ফলটি অক্ষত অবস্থায় নিম্নের তৃণভূমিতে পতিত হতে পারে।

এই অবস্থায় দুবার শর-সন্ধানেও যখন ব্যর্থ হল বিক্রমকেশরী, তখন ধনুশ্বর হাতে তুলে নিল কুমারজীব। জয় হল একাগ্রতার। কুমারজীবের নিক্ষিপ্ত শর বৃন্তের ক্ষুদ্র অংশটিতে আঘাত করল। নিঃশব্দে ফলটি পতিত হল তৃণভূমিতে।

চম্পা ফলটি কুড়িয়ে এনে কুমারজীবের হাতে তুলে দিয়ে বলল, এ ফল তোমার। তুমি ছাড়া কেউ ফলটি এমন করে পাড়তে পারত না।

কুমারজীব বলল, আমার চেয়ে অনেক বড় ধনুর্ধর বিক্রমকেশরী। আজ হয়তো ওর ইচ্ছাই ছিল না এই ফলটিকে বৃক্ষ থেকে ছিন্ন করার। তাই ও বিফল হয়েছে।

বাক্ বলল, বেশ, অন্য কোনো লক্ষ্য স্থির করে ধনুর্বিদ্যার পরীক্ষা হোক।

ক্রোধে, অপমানে তখন স্ফুরিত হচ্ছিল বিক্রমকেশরীর ওষ্ঠ। সে সহসা কোষ থেকে অসি বের করে প্রচণ্ড বেগে এবং কৌশলে ঘোরাতে লাগল। অসহায় তিনটি প্রাণী দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল বিক্রমকেশরীর অসিচালনার কলাকৌশল।

কতক্ষণ পরে ঘর্মাক্ত দেহে অসিখানা কুমারজীবের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, সাধ্য যদি থাকে প্রদর্শন কর অস্ত্রচালনার কৌশল।

বাক্ উৎসাহ দিয়ে বলল, তুলে নাও তরবারি, দেখিয়ে দাও তোমার কৃতিত্ব।

কুমারজীব মাটি থেকে সযত্নে তরবারিখানা তুলে নিয়ে মাথায় ঠেকাল। তারপর ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেল বিক্রমকেশরীর দিকে। বলল, এ তরবারি আমার

হাতে শোভা পায় না ভাই বিক্রম। যথার্থ বীরের হাতেই এ অসির শোভা আর সার্থকতা। আজ থেকে আমি সবার সামনে প্রতিজ্ঞা করছি, কখনো, কোনো অবস্থাতেই আর অস্ত্র ধারণ করব না।

বিক্রমকেশরীর ক্রোধ ততক্ষণে মন্দীভূত হয়েছে। সে তরবারিখানা হাতে তুলে নিয়ে বীরের মত কোষবদ্ধ করল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ফলটি তুলে নিয়ে চম্পা ছুঁড়ে ফেলে দিল নদীর জলে। বলল, এই ফলটাই যত নষ্টের গোড়া। ও এখন ডুবে মরেছে। এবার চল, আমরা মিলেমিশে খেলা করি।

মহারাজ অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তিতে উদ্যান-বাটিকা উজ্জ্বল করে আবির্ভূত হন। জীবা পরম সমাদরে রাজাকে অভ্যর্থনা জানায়। দীর্ঘ সময় কেটে যায় সুখ-দুঃখের আলাপনে।

জীবার কাছে দু'দণ্ড বসতে পারলে রাজা অন্তরে বড় শান্তি পান। রাজ-পুরীতে যখন অবসর যাপন করেন তখন মনের মধ্যে চেপে বসে পাষাণের ভার। অমর্তপ্রভা-শূন্য পুরী অন্ধকারপুরী বলে মনে হয়। চম্পা অন্তঃপুরে থাকলে তিনি তাকে কাছে ডেকে নেন। অন্ধকার মনের কোণে একটুকরো আলো এসে পড়ে। চম্পার অবর্তমানে তিনি প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন তরী নিয়ে। পৌঁছে যান উদ্যান বাটিকায়। সুমার্জিত একটি মন তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করে থাকে। সেই মনে অনুরণিত হয় রাজার গোপন ব্যথার অস্ফুট ক্রন্দন-ধ্বনি।

মহারাজের সঙ্গে সুখদুঃখের আলাপনের সময় সহসা উদাস হয়ে যায় জীবা। তার মনে হয়, মহারাজ তার পরম বন্ধু। কুমারায়ণের পরে এতবড় সহৃদয় সুহৃদ তার জীবনে আর আসেনি। আবেগময় তাঁর আচরণ, কিন্তু কোনোভাবেই লঙ্ঘিত হয় না সম্ভ্রমের সীমা।

মহারাজ চলে গেলে জীবা মনে মনে ভাবে, সে কি দুর্বল হয়ে পড়েছে। তার আচরণের কোথাও কি এমন কিছু আছে যার সূত্র ধরে রাজার নিভৃত ভাবনার শাখা-প্রশাখা পুষ্পিত হতে পারে। হয়তো, হয়তো নয়। একই দুঃখে দুজনকে করেছে সমব্যথী।

একদিন মহারাজের সঙ্গে জীবার কথোপকথনের সময় অপ্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ এসে পড়ল।

জীবা বলল, মহারাজ, কুমারজীব বলেছিল, তার সহপাঠী বিক্রমকেশরী তেজস্বী ও নির্ভীক।

মেঘবাহন বললেন, যে কোন রাজসন্তানের এসকল গুণ থাকা একান্ত কর্তব্য।

অস্ত্রবিদ্যায়ও সে প্রভূত দক্ষতা অর্জন করেছে।

সে খবর আমার অজ্ঞাত নয়। তবে আপনার পুত্র কুমারজীব বড়ই বন্ধু-বৎসল। নিজের চেয়ে বন্ধুদের কৃতিত্ব সবার সামনে প্রচার করতে পারলে সে খুশী হয়।

মানুষকে বড় করে দেখতে শিখলে একদিন হয়ত নিজেও বড় হতে পারবে।

মহারাজ বললেন, গুরু মাধবস্বামী একদিন আমাকে বলেছিলেন, বৌদ্ধশাস্ত্রে তাঁর অধীত বিদ্যা থেকে কুমারজীবকে দেবার মত আর তাঁর কিছু নেই। এখন আপনার পুত্র গুরুদেবের কাছ থেকে গ্রহণ করছে হিন্দু দর্শনশাস্ত্রের পাঠ। তাছাড়া পালি, প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষাতে ব্যুৎপত্তি অর্জনের চেষ্টা করছে।

ও গুরুর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালনের চেষ্টা করে মহারাজ।

একটু থেমে প্রসঙ্গান্তরে গেল জীবা. মহারাজ, কুমারজীবের কাছে শুনেছি, চম্পা বৈদিক স্তোত্রগুলি অপূর্ব সুরেলা কণ্ঠে নিবেদন করতে পারে। শুধু তাই নয় ওরা যখন পাঠের অবসরে বিতস্তার তীরে ঘুরে বেড়ায় তখন চম্মা সুললিত কণ্ঠে আবৃত্তি করে শোনায় কত কাব্য।

প্রাসাদে কিছু কিছু স্তোত্র ওর মুখে আমি শুনেছি। এসব গুরু মাধবস্বামীরই কৃপা। উপযুক্ত আধারে তিনি উপযুক্ত বস্তু পরিবেশন করেন। এই ধরুন না, আশ্রম-কন্যা বাকের কথা। তিনি তাকে শিক্ষা দিচ্ছেন সমাজবিদ্যা। সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা থেকে সমাজ ব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করে তাকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

জীবা বলল, আমার ত্রুটি নেবেন না। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না গুরু মাধবস্বামী কেন বাককে সমাজবিদ্যায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠলেন।

মহারাজ মেঘবাহন বললেন, কারণটি অন্যের অজ্ঞাত হলেও আমার অজানা নয়।

জীবা কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে রইল রাজার মুখের দিকে।

মহারাজ একটু থেমে বললেন, গুরু মাধবস্বামী একদিন আমাকে আশ্রমকন্যা বাকের পূর্ব ইতিহাস বলেছিলেন। সমাজের একটি নিষ্ঠুর প্রথার ভেতর থেকে তিনি তুলে এনেছিলেন. বাক্‌কে। আপনি যদি বাকের কাহিনী শুনতে চান তাহলে আপনাকে শুনতে হবে গুরু মাধবস্বামীর পরিব্রাজক জীবনের কাহিনী।

জীবা তেমনি কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল।

মহারাজ শুরু করলেন গুরু মাধবস্বামীর আর এক কাহিনী।

মাধবস্বামী বেরিয়েছিলেন দেশভ্রমণে। বিচিত্র আচার-আচরণ আর বহু ধর্মের দেশ এই ভারতবর্ষ। তাকে দেখার, তার বিষয়ে জানার অপার আগ্রহ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তিনি। বয়স হয়েছিল তাঁর, কিন্তু মনের শক্তি ছিল অটুট। চিরকুমার মাধবস্বামীর পেছনের কোনো টান ছিল না। তিনি দেশভ্রমণে যাবার সময় আমার শত অনুরোধেও একটি সামান্য তাম্রমুদ্রা গ্রহণ করেননি। বলেছিলেন, ভয় নেই, তোমার গুরু কখনও অভুক্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে না।

পাটলিপুত্রে পৌঁছে তিনি সেখানকার বিখ্যাত বিদ্যায়তনগুলি দর্শন করলেন। তাঁর অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পেয়ে বিদ্যায়তনের অধ্যক্ষ তাঁকে বহু

সমাদরে আতিথ্য দান করলেন। সেখানে তিনি কয়েক দিবস অতিবাহিত করলেন হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শন আলোচনায়। নালন্দা থেকে নিমন্ত্রিত হয়ে পণ্ডিতেরা এলেন সে আলোচনায় যোগদান করতে। গুরু মাধবস্বামী সাধ্যমত শাস্ত্র আলোচনা করলেন, কিন্তু বৌদ্ধ শাস্ত্রে পরম সুপণ্ডিত গুরুদের কাছে তিনি নতি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। নিরভিমান ব্যক্তি মাধবস্বামী। তিনি বৌদ্ধ পণ্ডিতদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিক্ষা করলেন। হিন্দুদর্শন আলোচনায় পাটলিপুত্রের পণ্ডিতদের সঙ্গে তিনি তুল্যমূল্য বিবেচিত হলেন।

গুরু মাধবস্বামীর অন্তরে কিন্তু শান্তি ছিল না। তিনি নিশাকালে শয্যা গ্রহণ করে পার্শ্ববর্তী কক্ষের আবাসিকদের আলোচনা শুনতে পেলেন। তাতে নালন্দা এবং তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা চলছিল। নালন্দার তুলনায় তক্ষশীলা যে এখন নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে সে বিষয়ে বক্তারা মন্তব্য করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করছিল না।

দীর্ঘ রাত্রি গুরু মাধবস্বামী নিদ্রাহীন কাটাতে লাগলেন। শয্যা তাঁর কাছে মনে হল কণ্টকাকীর্ণ। তিনি তক্ষশীলার ছাত্র। তাঁর পরাভবের অর্থ তক্ষশীলার অসম্মান। মধ্যরাত্রে শয্যার পাশে এসে দাঁড়ালেন বৈয়াকরণ পাণিনী। বললেন, পড়েছ অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ? চারি সহস্র সূত্রের সমাবেশ সেখানে। আমি যখন তক্ষশীলায় অধ্যাপনা করি তখন ছাত্রদের পড়াতে পড়াতে রচনা করেছিলাম এই ব্যাকরণ। এখন সারা ভারতবর্ষ অনুসরণ করে এই গ্রন্থ। আমি তোমার মত এককালে ছাত্রও ছিলাম তক্ষশীলার।

পাণিনী অন্তর্হিত হলে আবির্ভূত হলেন ব্রাহ্মণ চাণক্য। বললেন, আমিও তো ছাত্র ছিলাম তক্ষশীলার। আমার রচিত অর্থশাস্ত্র ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তন-গুলির অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থ। তুমি নিশ্চয়ই পড়েছ আমার বহু শ্রমে রচিত পুস্তক।

ভেষজবিদ্ জীবক এলেন এরপর। বললেন, সাত বৎসরকাল আমি তক্ষশীলায় আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেছি। বহু বৃক্ষ, লতাগুল্মের ভেষজগুণ পরীক্ষা করে আমি গুরুর কাছ থেকে লাভ করেছি উপাধি। এই পাটলিপুত্রেই আমি শুরু করেছিলাম আমার চিকিৎসা। মহারাজ বিম্বিসারকে দুরারোগ্য ব্যাধির হাত থেকে মুক্ত করেছিলাম আমি। তাছাড়া তথাগত বুদ্ধের চিকিৎসার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার একাধিকবার। তুমি তো ভেষজবিদ্যা আয়ত্ব করেছ তক্ষশীলায়। আমারই শিক্ষাকেন্দ্রে তোমার শিক্ষা। তুমি তো ক্ষুদ্র নও।

সর্বশেষে এসে দাঁড়ালেন সুশ্রুত। বললেন, একশত সাতাশ প্রকার স্থূল ও সূক্ষ্ম যন্ত্র ব্যবহার করেছি আমি শল্যচিকিৎসায়। অস্থি সংযোজন, অঙ্গচ্ছেদ ও বিজোড়ন, যকৃৎ বিচ্ছেদ, প্লীহা বিদারণ প্রভৃতি বিষয়ে আমার অস্ত্রোপচার পদ্ধতি এখনও তক্ষশীলায় অনুসৃত হয়। আমার আবিষ্কৃত সূক্ষ্ম অস্ত্রে আমি একটি কেশকে লম্বালম্বি ভাবে দ্বিখণ্ডিত করতে পারতাম। তুমি আমাদের সকলের প্রিয় সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তোমাকে ন্যূন ভাববার অধিকার

কারও নেই। মহাচীন, গ্রীস, ইরান, বাহ্লীক, গান্ধার আর ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে বিদ্যার্থীরা সমবেত হয় তাকে কি কোনো ভাবে ছোট করা যায়।

প্রভাতে শয্যাত্যাগ করে মাধবস্বামী নিজেকে গ্লানিমুক্ত মনে করলেন। তিনি নগরীর বিভিন্ন চিকিৎসা কেন্দ্রে ঘুরে ঘুরে পাটলিপুত্রের চিকিৎসকদের অজ্ঞাত সব ভেষজ রোগীদের ওপর প্রয়োগ করতে লাগলেন। দু'দিনের মধ্যেই আশ্চর্য সব ফল ফলতে দেখা গেল। মুহূর্তে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল মাধবস্বামীর নাম। কাতারে কাতারে রোগী আসতে লাগল জনপদ থেকে। তিনি পাটলিপুত্রের চিকিৎসকদের রোগ সম্বন্ধে পরামর্শ দিতে লাগলেন। চারদিকে ধ্বনি উঠল, তক্ষশীলার এক ধন্বন্তরি চিকিৎসক এসেছেন।

সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত সদ্য দিগ্বিজয় সমাপ্ত করে মগধে ফিরেছিলেন। শোনা গেল তিনি বিশেষভাবে অসুস্থ। রথ থেকে অতর্কিতে প্রস্তরাকীর্ণ পথে পড়ে গিয়ে তাঁর উরুর অস্থি ভগ্ন ও স্থানচ্যুত হয়েছে।

রাজচিকিৎসকের প্রলেপ, বন্ধন ইত্যাদি ক্রিয়াকর্মে ব্যথার উপশম হচ্ছিল না। ঠিক সেইসময়ে পাটলিপুত্র ত্যাগ করে পূর্বমুখে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন গুরু মাধবস্বামী। বিশেষ বার্তাবহ রাজগৃহ থেকে পত্র নিয়ে এল পাটলিপুত্রের বিদ্যাভবনের অতিথিশালায়।

প্রধান অমাত্য পত্রটি লিখেছেন, গুরু মাধবস্বামীকে। সম্রাটের কর্ণে নাকি প্রবেশ করেছে গুরু মাধবস্বামীর চিকিৎসা বিষয়ে বিশেষ দক্ষতার কথা। তিনি তাঁর রোগারোগ্যের জন্য গুরু মাধবস্বামীর সাহায্যপ্রার্থী।

শেষে লিখেছেন, ভ্রাম্যমান মাধবস্বামীর ভ্রমণের সমস্ত ব্যয়ভার সম্রাট বহন করতে ইচ্ছুক। তাছাড়া সম্রাটের চিকিৎসা বাবদ ইচ্ছানুযায়ী সুবর্ণমুদ্রা তিনি রাজকোষ থেকে গ্রহণ করতে পারবেন।

গুরু মাধবস্বামী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদ বিশারদ ঋষি চরক তাঁর গ্রন্থের শুরুতে উল্লেখ করেছেন, 'অর্থের জন্য চিকিৎসা করবে না। সর্বজনের হিতকামনাই হবে চিকিৎসকের আদর্শ।'

আমি দুটি শর্তে সম্রাটের চিকিৎসার ভার নিতে পারি। প্রথমতঃ ব্যয়বহুল ভ্রমণ আমার অভিপ্রেত নয়। সেক্ষেত্রে ভ্রমণের ব্যয় ভার বহনের প্রশ্ন ওঠে না। দ্বিতীয়তঃ সুবর্ণমুদ্রার বিনিময়ে আমি সম্রাটের চিকিৎসা করতে অক্ষম।

শেষে গুরু মাধবস্বামী লিখলেন, যেহেতু কয়েক দিবস সম্রাটের রাজ্যে আমি অতিথি সেহেতু সম্রাটের চিকিৎসার ভার নেওয়া আমার কর্তব্য বলে মনে করি। অবশ্য পূর্বোক্ত দুটি সর্ত সাপেক্ষে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটের প্রেরিত অমাত্য স্বয়ং উপস্থিত হয়ে বহু সম্মান দেখিয়ে প্রাসাদে নিয়ে গেলেন গুরু মাধবস্বামীকে।

সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত বড়ই কাতর হয়ে পড়েছিলেন। অসহ্য যন্ত্রণায় নিদ্রাহীন

নিশি যাপন করছিলেন তিনি। গুরু মাধবস্বামী পরীক্ষা করে বললেন, অস্ত্রোপচারের আশু প্রয়োজন।

সন্নিকটে দাঁড়িয়েছিলেন রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামগুপ্ত। তিনি বললেন, আপনি নিশ্চয়ই জানেন কার ওপর আপনি অস্ত্রোপচার করতে চলেছেন ?

মাধবস্বামী উত্তর করলেন, সম্রাটই আমাকে তাঁর চিকিৎসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

শল্য চিকিৎসায় কোনো বিপর্যয় ঘটলে আপনি তার সমূহ দায়িত্ব বহন করতে প্রস্তুত আছেন ?

গুরু মাধস্বামীর মুখে কঠিন উত্তর এসে গিয়েছিল, কিন্তু তার পূর্বে সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, কুমার, চিকিৎসকের সঙ্গে এভাবে বাক্যালাপ রীতি বিরুদ্ধ। আমি এই পরিব্রাজককে সসম্মানে আমার চিকিৎসার জন্য আহ্বান করে এনেছি। জীবন-মৃত্যুর সমস্ত দায়-দায়িত্ব আমার।

গুরু মাধবস্বামী বেদনাহর ঔষধ রাজার ওপর প্রয়োগ করে অস্ত্রোপচার করলেন। যথাস্থানে অস্থি-সংস্থাপন করে উত্তম ভেষজপ্রলেপ দিয়ে নূতন বস্ত্র-খণ্ডে বেঁধে দিলেন।

সম্রাট ঔষধের প্রয়োগে সংজ্ঞাহীনের মত শয্যায় পড়ে রইলেন। মাসাধিককাল গুরু মাধবস্বামী রইলেন প্রাসাদে। সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন।

প্রাসাদ ত্যাগ করে চলে আসার সময় হলে সমুদ্রগুপ্ত গুরু মাধবস্বামীকে বললেন, অর্থের বিনিময়ে কখনো প্রাণকে কেনা যায় না। যে চিকিৎসক মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে জীবন দান করেন তাঁকে অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করাও অসম্ভব। তবু একটি অভিলাষ আছে, পূর্ণ করা না করা সম্পূর্ণ আপনার ইচ্ছাধীন।

মাধবস্বামী বললেন, বলুন সম্রাট, কি আপনার অভিলাষ ?

সম্রাট বললেন, আমি আপনাকে 'ভিষক-রত্ন' উপাধিতে ভূষিত করতে চাই।

মাধবস্বামী সামান্য সময় ভেবে বললেন, রাজি আছি সম্রাট, তবে আপনার মানপত্রে এইটুকু কথা যেন সংযোজিত হয়, ভুবনবিদিত তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার্থী মাধবস্বামী।

সম্রাট বললেন, অবশ্যই আপনার ইচ্ছানুযায়ী সুবর্ণপত্রে তক্ষশীলার নাম খোদিত থাকবে।

মানপত্র প্রদানের দিন বিরাট মণ্ডপের তলায় স্বয়ং সম্রাট পায়ে হেঁটে এসে বসলেন। বিভিন্ন বিদ্যায়তনের মহা মহা পণ্ডিতেরা সমবেত হলেন সভায়। নগরবাসী, জনপদবাসীতে পূর্ণ হয়ে গেল সভাস্থল।

পণ্ডিতেরা গুরু মাধবস্বামীর প্রশস্তি গাইলেন দেবভাষায়। সম্রাট প্রদত্ত মানপত্র পাঠ করলেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য।

তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি এইভাবে ঘোষিত হলে অন্তরে পরম শান্তি নিয়ে গুরু মাধবস্বামী আবার পথে নামলেন।

দীর্ঘ সময় মাধবস্বামীর পাটলিপুত্র পরিভ্রমণের কাহিনী শুনিয়ে মহারাজ মেঘবাহন কিছু সময়ের জন্য স্থির হয়ে বসে রইলেন।

জীবার দুই চোখে তখন অশ্রুর প্লাবন।

মহারাজ মেঘবাহন মুখ তুলে বিস্মিত হয়ে বললেন, আপনার চোখে অশ্রু!

জীবা চোখের জল মুছে বলল, মহারাজ, গুরু মাধবস্বামীর কাহিনী শুনে অন্তরে গভীর আনন্দের সঞ্চার হওয়াই স্বাভাবিক কিন্তু সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের প্রসঙ্গ উঠলে আমি আর নিজেকে স্থির রাখতে পারিনি।

এই অস্থিরতার কারণটুকু জানতে পারি কি?

বলব মহারাজ, অসঙ্কোচেই বলব। সে কাহিনী অনেক দীর্ঘ। অতি সংক্ষেপে তার সার কথাটুকু আপনাকে নিবেদন করছি।

জীবা শুরু করল, আমার স্বামীর সঙ্গেও আকস্মিক ভাবে দেখা হয়ে যায় সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের।

বিস্মিত হয়ে মেঘবাহন বললেন, আশ্চর্য! কোথায়, কিভাবে?

আমার তরুণ স্বামী তখন তক্ষশীলার পাঠ শেষ করে নালন্দার পথে যাত্রা করেছেন অনেক কৌতূহল নিয়ে। পথে এক অরণ্যে হঠাৎ সম্রাটের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে যায়।

মেঘবাহন বললেন, অরণ্যে, সম্রাটের সঙ্গে!

হ্যাঁ মহারাজ, সম্রাট তখন যৌধেয়, অর্জুনায়ণ জয় করার জন্য এগিয়ে চলেছেন। সন্ধ্যায় এক নদীতীর সংলগ্ন অরণ্যে পড়েছে সম্রাটের বিপুল বাহিনীর শিবির। সেখানে এক বৃক্ষে রাত্রিবাসের জন্য আমার স্বামীও আশ্রয় নিয়েছিলেন। সন্ধ্যার অরণ্যে চন্দ্রোদয় হল। সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত হাতে তুলে নিলেন তাঁর বীণা। অপূর্ব সুরের যাদুতে আচ্ছন্ন হল চরাচর। সেই মুহূর্তে আমার স্বামী ওষ্ঠে তুলে নিলেন তাঁর নিত্যসঙ্গী মুরলী। সম্রাটের বীণার সঙ্গে সঙ্গে সুমধুর মিলন ঘটল বাঁশরীর।

সহসা বন্ধ হয়ে গেল সম্রাটের বীণা। তিনি আমার স্বামীকে আহ্বান জানালেন তাঁর মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য।

আমার স্বামী সম্রাটের সামনে এসে দাঁড়ালেন। সেই থেকে গভীর প্রীতির বন্ধন গড়ে উঠল সম্রাটের সঙ্গে আমার স্বামীর।

সেই সময় আর একটি ঘটনা ঘটল, যার ভেতর জড়িয়ে পড়ল আমার স্বামীর সঙ্গে একটি মেয়ের ভাগ্য।

কথার মাঝে থেমে গেল জীবা। সে ভাবতে লাগল ঘটনার শেষ অংশটুকু সে কেমন ভাবে বলবে।

তাকে থামতে দেখে মহারাজ মেঘবাহন বললেন, ঘটনা বর্ণনা করতে যদি আপনার দ্বিধা আসে তাহলে আপনাকে নিশ্চয়ই বলার জন্য আমি অনুরোধ জানাব না।

না মহারাজ, আজ সেই ঘটনার আবর্তে ভেসে যাওয়া দুটি নরনারীর কেউই ইহলোকে বর্তমান নেই। আমি নির্দ্বিধায় সেই সত্য কাহিনীর চুম্বকটুকু আপনাকে শোনাচ্ছি।

সম্রাটের কাছে নতি স্বীকার করে কোনো রাজা কর দানে তাঁকে তুষ্ট করেছেন। কেউ বা রাজপতাকায় গুপ্ত সম্রাটের প্রতীক গ্রহণ করে স্বীকার করেছেন তাঁর বশ্যতা। আবার কোনো রাজা উপঢৌকন রূপে সম্রাটের হাতে সমর্পণ করেছেন আপন কন্যাকে।

তেমনি এক কন্যা সে সময় সম্রাটের সঙ্গে সেই অরণ্যে অবস্থান করছিল। নাম তার বেতসা। এরপর অরণ্য ত্যাগ করে সম্রাট যখন পশ্চিম মুখে অভিযানের জন্য প্রস্তুত হলেন তখন জ্যোতিষ শাস্ত্রবিদ বললেন, মহারাজ, নারীকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করলে শুভ ফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা কম।

সম্রাট জ্যোতিষের বাক্য শিরোধার্য করলেন। তিনি আমার স্বামীকে আহ্বান করে বললেন, কুমারায়ণ, নালন্দায় যাবার অভিপ্রায় ছিল তোমার। আমি দ্রুতগামী অশ্ব-যোজিত রথ দিচ্ছি। তুমি বেতসাকে নিয়ে চলে যাও আমার প্রাসাদে। তুমি বিদ্বান, সঙ্গীতে অনুরাগী, তার ওপর নিপুণ অস্ত্রবিদ। তোমার ওপর বেতসার নির্বিঘ্ন যাত্রার ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই।

আমার স্বামী সম্রাটের কাছ থেকে দায়িত্ব পেয়ে বেতসাকে নিয়ে চললেন পাটলিপুত্র অভিমুখে। দীর্ঘ পথযাত্রায় নানা ঘটনার মধ্যে আমার স্বামীর পরাক্রম, বুদ্ধিমত্তা ও সহৃদয়তার পরিচয় পেয়ে বেতসা তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়।

মহারাজ মেঘবাহন সবিনয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনার স্বামীও কি বেতসার প্রতি অনুরক্ত হয়েছিল ?

হ্যাঁ মহারাজ। তবে তিনি সম্রাটের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার কোনো কাজই করেননি।

পরে যখন সম্রাট প্রাসাদে ফিরে এলেন তখন প্রতিদিন প্রাসাদ থেকে অতিথিভবনে আমার স্বামীর কাছে আহ্বান আসত। দুজনে প্রাসাদের অন্তঃপুরে বহুরাত্রি অবধি সঙ্গীত চর্চায় মগ্ন থাকতেন। সেখানে চকিতে বেতসার সঙ্গে হয়তো দৃষ্টি বিনিময় হত আমার স্বামীর।

একসময় সম্রাট গেলেন তাঁর মাতুলালয়ে। সেই সুযোগে এক রাত্রে প্রাসাদ থেকে অতিথিভবনে চলে এল বেতসা। সে তখন উত্তেজনায় কাঁপছিল। সে যা বলে গেল তার অর্থ হল, অতি দ্রুতগামী দুটি অশ্বের ব্যবস্থা সে করেছে। পলায়নের এই সুবর্ণসুযোগ।

আমার স্বামী তাকে অনেক বুঝিয়ে নিবৃত্ত করলেন। কিন্তু যার অন্তরে রাত্রিদিন জ্বলছে কামনার অগ্নি, তাকে নিবৃত্ত করবে কে !

সম্রাট ফিরে এলেন। ফাল্গুনে প্রাসাদ থেকে দূরে রাজ-উদ্যানে শুরু হল মদনমহোৎসব। এ উৎসবে রাণী ও রাজপুরাঙ্গনারাই উপস্থিত থাকেন। পুরুষ

কেবলমাত্র সম্রাট। সেখানে বিশেষভাবে নির্মিত মদনমন্দিরে রাণীরা একে একে প্রেমের দেবতা মদনকে অর্ঘ্য দান করেন। তারপর রাজাকে রঞ্জিত করেন কুমকুম চূর্ণে।

সেই মদনমহোৎসবেই সম্রাট বেতসাকে প্রধানা সেবিকার পদ থেকে রাণীর মর্যাদা দান করবেন, এমনই পরিকল্পনা ছিল। সম্রাট দীর্ঘদিনের নিয়ম ভঙ্গ করে সেই উৎসবে সঙ্গে নিলেন আমার স্বামীকে।

উৎসবের সমাপ্তিপর্বে ঘটল সেই দারুণ অঘটন। বেতসা মদনমন্দিরে আরতি শেষ করে মহারাজের চরণে কুমকুম দিতে আসবে, আর মহারাজ তাকে বরণ করবেন রাণীর মর্যাদায়। কিন্তু বেতসা আর মদনমন্দির থেকে বেরিয়ে এল না। সহসা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল দাহ্যপদার্থে তৈরী মন্দিরটি। মুহূর্তে সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এমনি করে বেতসা বেছে নিল তার আত্মহননের পথ।

মহারাজ মেঘবাহন, বললেন, আশ্চর্য ঘটনা।

জীবা বলল, আপনার মুখে সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের কথা শুনে বেতসা আর আমার স্বামীর কথা মনে পড়ল। তাই চোখের জল রোধ করতে পারিনি মহারাজ।

জীবা কিছুসময় নীরব থেকে বলল, এখন বলুন মহারাজ বাক্ আর গুরু মাধবস্বামীর কাহিনী।

মহারাজ শুরু করলেন, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়নি, গুরু মাধবস্বামী প্রবেশ করলেন গঙ্গাতীরবর্তী একটি গ্রামে। গ্রামখানি ছিল ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত। তিনি ক্ষুধার্ত ছিলেন তাই সম্মুখে যে গৃহটি দেখলেন, সেখানেই আহার্যের জন্য কিছু প্রার্থনা করতে মনস্থ করলেন।

দ্বারে কয়েকবার করাঘাত করতেই একটি শিশুর ক্রন্দনধ্বনি শোনা গেল। পরক্ষণেই দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়াল একটি যুবতী। বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসরের অনধিক বলেই মনে হল।

মাধবস্বামী বললেন, মা, আমি পরিব্রাজক। বড়ই ক্ষুধার্ত। কিছু আহার্যের প্রত্যাশা করি।

যুবতী বধূটি গৃহে প্রবেশ করে একটি আসন এনে দাওয়ায় বিছিয়ে দিয়ে বলল, আপনি আসন গ্রহণ করুন বাবা, সামান্য যা আছে তা আপনার সেবার জন্য এনে দিচ্ছি।

মাধবস্বামী লক্ষ্য করলেন সারা গৃহে দারিদ্র্যের ছাপ। তারই ভেতর থেকে বধূটি সামান্য কিছু আহার্য এনে রাখল।

তার পরিবেশনের মধ্যে এমন আন্তরিকতা আর শ্রী ছিল যে গুরু মাধবস্বামী মুগ্ধ হয়ে গেলেন। আহারান্তে আচমন করে এসে জিজ্ঞেস করলেন, মা, তোমার বাড়িতে কোনো পুরুষমানুষকে দেখছি না কেন?

আমার স্বামীই এ বাড়িতে একমাত্র পুরুষ। কিন্তু বাবা, তিনি বড়ই অসুস্থ। তাঁর উত্থানশক্তি নেই।

কে তাঁর চিকিৎসা আর দেখাশোনা করছে মা?

শূন্যের দিকে দুটি হাত তুলে মেয়েটি জানিয়ে দিল, ভগবান।

মুখে বলল, প্রতিবেশী জ্ঞাতিগোত্র কিছু দূরেই রয়েছেন, তবে তাঁদের সঙ্গে বড় একটা সম্প্রীতি নেই। তাঁরা এতবড় বিপদের কথা শুনে একবারও এসে দাঁড়াননি।

আমি একবার তোমার স্বামীকে দেখতে পারি মা?

আসুন বাবা।

বধূটি মাধবস্বামীকে পথ দেখিয়ে ভেতরে নিয়ে গেল। শয়ন গৃহখানি অতি ক্ষুদ্র। একটি প্রদীপ গৃহকোণে প্রজ্জ্বলিত। শিশুকন্যাটি অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছে। সম্ভবত দ্বারে করাঘাতের শব্দে সে একবারমাত্র জেগে উঠে ক্রন্দনের মাধ্যমে তার প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

রোগগ্রস্ত ব্যক্তিটির বিশেষ কোন চেতনা ছিল না। গুরু মাধবস্বামীর নির্দেশে বধূটি গৃহকোণ থেকে প্রদীপটি রোগীর শয্যাপার্শ্বে নিয়ে এল।

রোগীর মুখমন্ডলে এসে পড়েছে ক্ষীণ আলোক রশ্মি। চমকে উঠলেন গুরু মাধবস্বামী। ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলেন ঘরের বাইরে।

একটু পরেই বধূটিও তাকে অনুসরণ করে এসে দাঁড়াল। সহসা চিন্তিত মাধবস্বামীর দুটি পা জড়িয়ে ধরে মেয়েটি বলল, বাবা, কেমন দেখলেন? উনি এ যাত্রায় রক্ষা পাবেন তো?

মেয়েটির মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মাধবস্বামী বললেন, কোথাও কি কেউ অমর আছে রে মা। কেউ আজ, কেউ কাল। দেহের ছায়ার মত মৃত্যু ঘুরে ফিরছে জীবনের সঙ্গে।

মেয়েটি এখন স্থির হয়ে বসে বলল, বাবা, আমি আমার ভাগ্যের পরিণতি বুঝে নিয়েছি। আমি জানি, আমার ভাগ্যের দেবতা আজ সন্ধ্যায় আপনাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমার অনুরোধ ওঁর দেহবসান যতদিন না হয় আপনি কৃপা করে এখানে অবস্থান করুন। উপযুক্ত সময়ে হয়তো আপনি মেয়েকে কিছু সাহায্য করতে পারবেন।

প্রথমে মেয়েটি দুর্বল হয়ে পড়েছিল, পরে তার মানসিক শক্তি প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। এই পরিস্থিতিতে মাধবস্বামী তার চিত্তের দৃঢ়তা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন।

মাধবস্বামী বললেন, মা, তোমার অন্তরের শক্তি দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। তাই তোমার কাছে সত্য গোপন করে লাভ নেই। তুমি প্রস্তুত হও মা। গ্রামস্থ জ্ঞাতিদের সংবাদ দাও। শেষ কৃত্যে তাঁদের সাহায্য তোমার অবশ্য প্রয়োজন। আমি চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শী। সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত স্বয়ং আমাকে শ্রেষ্ঠ

চিকিৎসকের শিরোপা দিয়েছেন। কিন্তু মা, তোমার স্বামীর ক্ষেত্রে আমি অসহায়। স্বয়ং কৃতান্ত রোগীর শিয়রে এসে বসে আছেন। তাঁর ছায়া পড়েছে তোমার স্বামীর মুখে। মর্ত্যবাসী আমার এ ক্ষমতা নেই যে কৃতান্তকে সরিয়ে আমি তোমার স্বামীকে উদ্ধার করি। আমার ধারণা, আকাশের ঐ চন্দ্রমার অস্তগমনের সঙ্গে সঙ্গে তোমার স্বামীও এই মরদেহ ত্যাগ করে অমরলোকে প্রস্থান করবেন।

মেয়েটি অবস্থার গুরুত্ব ও অনিবার্যতা উপলব্ধি করে গুরু মাধব স্বামীর উপদেশমত জ্ঞাতি ও গ্রামস্থ মানুষজনকে সংবাদ দেবার জন্য চলে গেল। যারা বিপদে একবারও পাশে এসে দাঁড়ায়নি তারা ভীড় করে এল মৃত্যুদৃশ্য দেখতে।

গুরু মাধবস্বামীর অনুমান মিথ্যা হয়নি। চন্দ্রের অস্তগমনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণের প্রাণপুরুষ মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেল।

এরপর দিবালোক প্রস্ফুটিত হলে সমাজপতিদের সভা বসল। সিদ্ধান্ত হল, বধূকেও স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হতে হবে। গর্ভস্থ সন্তান থাকলে স্ত্রীলোকের স্বামীসহ চিতারোহণ নিষিদ্ধ হত কিন্তু এক্ষেত্রে কন্যার বয়ঃক্রম এক বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে।

বিদ্যুৎ চমকের মত সহমরণের খবর গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে প্রচারিত হয়ে গেল। দলে দলে নারী পুরুষ শঙ্খধ্বনি করে, কাঁসরঘণ্টা বাজিয়ে জড়ো হতে লাগল অরণ্য সংলগ্ন গঙ্গা তীরবর্তী শ্মশানে। স্থানটি কয়েক দণ্ডের মধ্যে পূর্ণ হয়ে গেল কোলাহলে।

মেয়েটি গুরু মাধবস্বামীকে অনুচ্চে বলল, বাবা, এই আমার নিয়তি। ওরা আমাকে বাঁচতে দেবে না। সমাজপতি আমার স্বামীর জ্ঞাতিভ্রাতা। আমার এই ক্ষুদ্র ভদ্রাসনটির ওপর তাঁর বহুদিনের লোভ। অর্থ দিয়ে ক্রয় করতে চেয়েছিলেন, সম্মত হননি আমার স্বামী। এখন সুবর্ণসুযোগ তাঁর হাতে। অবশ্য স্বামীর ভিটেয় যদি আমি বসবাসও করতাম তা হলেও ওরা আমাকে সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে দিত না। তার চেয়ে আমার মৃত্যু ভাল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেয়েটি বলল, শুধু ভাবনা আমার শিশুকন্যাটিকে নিয়ে।

একটু থেমে কাতর গলায় বলল, বাবা আপনি কি আমার অসহায় হতভাগ্য মেয়েটিকে রক্ষা করতে পারেন না? আপনি রাজি থাকলে আমি সমাজপতির কাছে শেষ অনুরোধ জানাব, মেয়েটিকে আপনার হাতে তুলে দেবার জন্য। তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, লোভী মানুষটা আপত্তি জানাবে না। তার পথের শেষ কাঁটাটি সরে যাবে ভেবে বরং খুশীই হবে।

তাই হল। মেয়েটির ভার তার মায়ের শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী অর্পণ করা হল গুরু মাধবস্বামীর হাতে।

বধূটি চিতায় যাবার আগে বলেছিল, বাবা কার না ইচ্ছে করে এ পৃথিবীতে বাঁচতে। কে চায়, জ্বলন্ত আগুনে অসহায় অবস্থায় পুড়ে ছাই হয়ে যেতে।

তার শেষ কথা ছিল, আপনি আমার শিশুকন্যাটিকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকুন। আমি ওর দিকে চেয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করব।

থামলেন মহারাজ মেঘবাহন। বললেন, এই হল আশ্রম কন্যা বাকের ইতিহাস। গুরু মাধবস্বামী যে উপযুক্ত আধারে উপযুক্ত শিক্ষার পানীয়টি ভরে দিতে জানেন, আশা করি সে সম্বন্ধে আপনার ধারণা এখন স্পষ্ট হল। বাকের সমাজবিদ্যা শিক্ষার পেছনে গুরুর এই নির্মম অভিজ্ঞতাই কাজ করে চলেছে।

জীবা বলল, বিচিত্র অভিজ্ঞতা গুরু মাধবস্বামীর।

তিন

তুমি তক্ষশীলায় কেবল যুদ্ধবিদ্যাই শিখবে বিক্রমকেশরী?

তার সঙ্গে রাজনীতির পাঠ নেব বাক্।

মানুষের কথা জানবে না, মানুষের সুখ দুঃখের কথা?

হেসে বলল বিক্রমকেশরী, সেটা তোমার জন্যে তোলা রইল।

এমন কথা বল না বিক্রম। তুমি একদিন রাজার আসনে বসবে, তার আগে মানুষের কিসে সুখ কিসে দুঃখ জেনে নেবে না? রাজা হলে তাকে প্রজার দুঃখ দূর করতে হবে।

প্রজা যদি রাজাকে ভয় না করে তাহলে তার কাছে থেকে সমীহ আদায় করা যায় না বাক্।

কিন্তু ভালবাসা? তার চেয়ে মূল্যবান মানুষের কাছ থেকে পাবার কি আছে বল? তুমি মানুষকে ভালবাসলে একদিন তার হৃদয়ে রাজার আসনে বসবে।

তোমার কথা মনে রাখব বাক্।

এবার লঘু হল বাকের কণ্ঠ, তুমি তক্ষশীলায় গিয়ে শুধু আমার কথাগুলোই মনে রাখবে, আমাকে মনে রাখবে না?

মনে রাখব বাক্! আমি কখনো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে তুমি কেমন করে আমার অস্ত্রগুলো লুকিয়ে ফেলতে সে কথা মনে পড়বে। আরও মনে পড়বে, তুমি আমাকে অব্যর্থ লক্ষ্যভেদের জন্য কত প্রেরণা দিতে।

সে কথা থাক, এখন আমার একটি শুধু অনুরোধ তোমার কাছে।

বল।

তক্ষশীলায় গিয়ে কুমারজীবের সঙ্গে অটুট রাখবে তোমার বন্ধুত্ব।

আমার দিক থেকে চেষ্টার কোনো ত্রুটি থাকবে না।

তা হলেই আমি নিশ্চিন্ত বিক্রম।

এত বিশ্বাস তোমার কুমারজীবের ওপর?

বাক্ বিক্রমের হাত স্পর্শ করে বলল, তোমার ওপরেও আমার বিশ্বাস কম নয় বিক্রমকেশরী। তবে তুমি রাজার ছেলে, সহসা ক্রোধের বশবর্তী হও। তোমার শৌর্য, বীর্য, বিবেচনার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছি আমি। আবার কুমারজীবের স্থির শান্ত ভাব, বন্ধুপ্রীতির প্রশংসাও কম করিনি।

একটা কথার স্পষ্ট উত্তর দেবে বাক্ ?

নিশ্চয়ই।

তুমি দুজনের ভেতর কাকে বেশী ভালবাস ?

দুজনের প্রতি আমার ভালবাসার কোনো তারতম্য নেই।

উত্তেজিত হল বিক্রমকেশরী, এ হয় না বাক্ হতে পারে না। এক নদী তার দুই শাখানদীকে সমান জল কখনো ভাগ করে দিতে পারে না।

সজল হয়ে উঠল বাকের চোখ। তার দুই কপাল বেয়ে দুটি অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়ল। বিক্রমকেশরী বিচলিত হয়ে বলল, বাক্, তুমি কাঁদছ !

অমনি হাসি ফুটে উঠল সজল মেঘে রৌদ্রের লীলার মত।

বাক্ বলল, তোমরা দুজনেই আমার দু'বিন্দু অশ্রু। আমার ভালবাসা, আমার আনন্দ সেই অশ্রুবিন্দুর ওপর পড়ে রামধনুর খেলা খেলে।

বিক্রম অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল, ঐ যে বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে কুমারজীব আর চম্পা। চল ওদের ধরা যাক।

বাক্ আর বিক্রম দুজনেই ওদের দিকে এগিয়ে গেল।

চম্পা হাতে ধরে রাখা একটি ফুল বিক্রমকেশরীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, এই নাও তোমার উপহার।

ফুলটি হাতে ধরে গন্ধ নিয়ে বিক্রম বলল, চমৎকার, যেমন দেখতে তেমনি মিষ্টি গন্ধ।

বাক্ সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করল, ঠিক চম্পার মত।

কুমারজীব হেসে বলল, আমি তোমার মন্তব্যকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি বাক্।

বিক্রম বলল, আমার কিন্তু ভিন্ন মত। সৌন্দর্য সম্বন্ধে আমার দ্বিমত না থাকলেও চম্পা তার সৌরভ সম্বন্ধে কৃপণ। সবাইকে সে তার অন্তরের সুবাস বিলিয়ে দেয় না।

বিক্রমের মন্তব্যে আহত বাক্ বলল, চম্পা কৃপণ নয় বিক্রম, ও ভীরু। নিজেকে প্রকাশ করতে চিরদিনই দ্বিধা ওর।

বিক্রম এবার সম্পূর্ণ ভিন্ন কথার অবতারণা করল, চল চম্পা, বনের ভেতর থেকে মনের মত ফুল তুলে তোমাকে উপহার দিই।

কুমারজীব বলল, বিক্রমের তুলনা নেই। ওর আপাত কঠোর মনের ভেতর আর একটা কোমল দরদী মন লুকিয়ে রয়েছে। যাও চম্পা, বীরের হাত থেকে শ্রেষ্ঠ পুরস্কারটি নিয়ে নাও।

বিক্রমের সঙ্গে চম্পা চলে গেল অরণ্যের মধ্যে।

বাক্ এবার মুখোমুখি হল কুমারজীবের।

তুমি অতুলনীয় কুমারজীব।

তক্ষশীলায় যাত্রার আগে একি বাকের উপহার?

আমার উপহার দেবার সম্পদ বা সামর্থ্য কোথায় কুমারজীব।

কেন, বাকের সুললিত বাক্য কি যে কোন মূল্যবান বস্তুর চেয়েও শ্রেষ্ঠ উপহার নয়।

তুমি নির্লোভ তাই সামান্য মুখের কথা তোমার কাছে এত দামী।

এবার ভিন্ন একটি কথার অবতারণা করল কুমারজীব, গুরু মাধবস্বামী কি বলেছেন জান?

বাক্ মুগ্ধ শ্রোতার মত মুখখানি কাত করে কুমারজীবের দিকে চেয়ে রইল।

'তক্ষশীলার পাঠ শেষ করে ফিরে আসার পর যদি আমাকে দেখতে না পাও তাহলে বাকের শুভাশুভের ভার তুমিই গ্রহণ কর।'

বাকের মুখ সহসা প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। পরমুহূর্তেই ম্লান ছায়া ঘনাল সে মুখে। সে বলল, আচার্যদেব কেন এমন কথা বললেন কুমারজীব! তিনি কি তাঁর জীবনকাল খুবই সীমিত বলে ভাবছেন!

তা নয় বাক্। মানুষের আয়ুষ্কাল সম্বন্ধে কে কবে নিশ্চিতভাবে শেষ কথাটি বলতে পেরেছে! তিনি হয়তো সম্ভাবনার ওপর নির্ভর করেই কথাগুলো বলেছেন।

সে যা হোক্, আচার্যের কথার কি উত্তর দিলে তুমি?

গুরুর আদেশ শিরোধার্য করতে হয় বাক্। এখানে কোনোরকম উত্তর প্রত্যুত্তর চলে না।

বাক্ কৌতুক কণ্ঠে বলল, ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা বাড়ল আমার, কি বল?

দায়িত্ব পালনের অক্ষমতা জানিয়ে গুরুর আদেশকে তো এড়িয়ে যেতে পারি না।

এবার বাক্ বলল, দাঁড়াও, তোমার জন্যে একটি উপহার তৈরি করে রেখেছি, নিয়ে আসি।

কি উপহার বাক্?

বাঃ, উপহারের কথা আগেভাগে কেউ বলে দেয় নাকি। নিয়ে আসি, তখন নিজেই দেখতে পাবে।

বাক্ আশ্রম-কুটীরে চলে গেল। কুমারজীব একাকী আশ্রমের তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে তার দীর্ঘ আশ্রম-জীবনের কথা ভাবতে লাগল।

কত শিক্ষা, কত সুখ, কত সাহচর্য। গুরুর সর্ববিষয়ে কি সুতীক্ষ্ম দৃষ্টি! তাঁর সান্নিধ্যে জীবন পূর্ণ আর ধন্য হয়ে যায়। অন্যদিকে বাক্, সে যেন আশ্রমের ছায়াতরু। তপ্ত, ক্লান্ত মনকে এমন করে স্নিগ্ধ শান্তিতে ভরে দিতে তার জুড়ি নেই।

বিক্রমকেশরীর অন্তরে প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার, সে রাজপুত্র। কিন্তু সে গুণহীন নয়। বীর্যবান, বন্ধুবৎসল। কেবল প্রতিযোগিতায় পরাজিত হলে সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, তখন তার হিতাহিত জ্ঞান সাময়িকভাবে লুপ্ত হয়ে যায়। এ সম্ভবত রাজরক্তের অন্ধ অহঙ্কার।

কিন্তু কি আশ্চর্য! চম্পা সামনে এলে বিক্রমকেশরীর আচরণে ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায় না। সে চম্পার সান্নিধ্য ভীষণভাবে কামনা করে। চম্পা তার প্রশংসা করলে সে সেই প্রশংসাকে তৃষ্ণার্তের মত পান করে তৃপ্ত হয়।

চম্পা মহারাজ মেঘবাহনের কন্যা, তাই কি রাজপুত্রের তার প্রতি প্রচ্ছন্ন আনুগত্য? তার সামান্য প্রশংসায় সে বিহ্বল, বিগলিত?

চম্পা! অসামান্য ঔদার্য নিয়ে জন্মেছে সে। যা কিছু তার আছে সবকিছু বিলিয়ে দিয়েই তার আনন্দ। অভিজাত তার পদক্ষেপ, ততোধিক অভিজাত তার আচরণ। সে আচার্যের প্রতিটি বাক্য বৈদিক ঋষির নির্দেশ বলে মনে করে। বন্ধুদের সঙ্গে তার সদাচারের তুলনা হয় না। প্রতিটি পশুপক্ষীর প্রতি তার করুণার শেষ নেই। অশেষ ঐশ্বর্যের অধিকারিণী সে, তাই অহঙ্কার তাকে অধিকার করতে পারেনি।

শ্যামল প্রান্তরের বুকে দাঁড়িয়ে নির্মল নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে কুমারজীব মনে মনে স্তোত্রের মত উচ্চারণ করতে লাগল, হে আকাশ, তুমি তোমার মেঘবারি বর্ষণে আমাদের আশ্রমটিকে স্নান করিয়ে দিও। তোমার সূর্যালোক স্পর্শে অরণ্য বৃক্ষগুলি লাভ করুক নবীন জীবন। তোমার চন্দ্রকিরণে স্নিগ্ধ হোক্, পূর্ণ হোক্ আশ্রমবাসীর প্রাণ।

এবার আশ্রমের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল, হে আশ্রমজননী, তোমাকে ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে আমাদের। যেখানে যাই, যতদূরে যাই, কখনো ভুলতে পারব না তোমার কথা। বৃদ্ধ আচার্যদেব রইলেন, আর রইল আমাদের সবার প্রিয়সখী বাক্। তুমি তাদের জননীর সদা জাগ্রত দৃষ্টিতে রক্ষা কর।

বাক্ সামনে এসে দাঁড়াল।

কুমারজীব তার দিকে হাতখানি প্রসারিত করে দিয়ে বলল, কই আমার উপহার?

বাকের মুখে হাসির রেখা। সে একখানি চিত্রিত পট কুমারজীবের হাতে ধরিয়ে দিল।

কুমারজীব পরতে পরতে পটখানি খুলে চোখের সামনে মেলে ধরল। চারি অংশে বিভক্ত পট। প্রথম অংশে, সিদ্ধার্থ চলে যাচ্ছেন রাজপুরী ত্যাগ করে। পেছনে প্রাসাদ, সামনে রথ। সিদ্ধার্থের দৃষ্টি অন্তর্লোকে।

দ্বিতীয় অংশে, পত্নী যশোধরা রাহুলকে বুকে জড়িয়ে নির্নিমেষ চেয়ে আছেন রাজপথের দিকে। সর্বস্ব হারানোর হাহাকার স্তব্ধ হয়ে আছে তাঁর দৃষ্টিতে।

এরপর তৃতীয় অংশে, বুদ্ধ বসে আছেন মহাদ্রুমের তলায়। শিষ্যেরা বসে

আছেন তাঁর সম্মুখে। বুদ্ধ তথাগত দক্ষিণকর উত্তোলন করে তাঁদের উপদেশ দান করেছেন।

চতুর্থ বা শেষদৃশ্যে বুদ্ধ বসেছেন আহারে, তাঁকে আহার্য নিবেদন করছেন আম্রপালী।

সবার নিম্নে লেখা আছে একটিমাত্র ছত্র : 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'।

এবার বাকের মুখের দিকে তাকাল কুমারজীব। আনন্দে বিস্ময়ে সে রুদ্ধবাক।

তুমি খুশী হওনি ?

কুমারজীব বলল, এ আনন্দ প্রকাশের ভাষা আমার নেই বাক্।

তুমি চিত্রাঙ্কন করতে, কিন্তু এমন জীবন্ত চিত্র তোমার তুলিতে প্রকাশ পাবে, তা ছিল আমার কল্পনারও বাইরে। তোমার অন্তরের আসনে প্রভু বুদ্ধ বিরাজ না করলে সম্ভব হত না এমন ধ্যানের সৃষ্টি।

একটি কথা বলবে ?

বল।

তোমার বিদায় দিনের স্মরণে চম্পা তোমাকে কি দিয়েছে ?

সর্বস্ব।

সর্বস্ব !

হাঁ বাক্। সে আমার অঞ্জলিতে তার মুখখানা রেখে শুধু বলেছে, আমার যা কিছু সব তোমাকে দিলাম।

তুমি কি বললে ?

বললাম, আমি ভিক্ষু, বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত, তা জেনেও তুমি আমাকে সর্বস্ব দান করলে ! জান না আমাদের নিজের বলতে কিছু রাখতে নেই, সবই ধর্ম-সঙ্ঘের।

চম্পা বলল, আমি তো সমর্পণ করে মুক্ত, তারপরের করণীয় তোমার।

বাক্ উদ্গত অশ্রুকে রোধ করে বলল, চম্পা সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার তোমার হাতে তুলে দিয়েছে কুমারজীব।

অন্তরের স্পর্শমাখা সকল উপহারই মূল্যের বিচারে সমতুল্য বাক্। তোমরা দুজনেই কুমারজীবের স্মৃতিতে সমানভাবে সঞ্জীবিত রইবে চিরদিন।

কুমারজীব বিক্রমকেশরীর সঙ্গে শিক্ষার অভিলাষে চলে গেছে তক্ষশীলায়। জননী জীবা পুত্রকে বিদায় দিয়েছে হাসিমুখে কিন্তু নিশীথ শয্যায় শুয়ে উপাধান সিক্ত করেছে চোখের জলে।

মহারাজ মেঘবাহন সবকিছুই অনুভব করেন। জীবার মাতৃহৃদয়ের বেদনা তাঁরও হৃদয়ে গিয়ে বাজে। তিনি প্রায়ই প্রাসাদ থেকে উদ্যানবাটিকায় নিয়ে আসেন চম্পাকে। কয়েকদিন চম্পা কাটিয়ে যায় জীবার সান্নিধ্যে। জীবা

স্নেহমমতায় পূর্ণ করে দেয় রাজকন্যা চম্পার হৃদয়।

কখনো মহারাজ একাই আসেন জীবার নিঃসঙ্গতাকে দূর করতে। দীর্ঘ দশটি বছরের সান্নিধ্য দুটি হৃদয়কে অনেক নিকটে এনে দেয়। মহারাজ যখন অমর্তপ্রভার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে পীড়িত হয়ে পড়েন তখন প্রাসাদ ছেড়ে চলে আসেন উদ্যান-বাটিকায়। জীবা মহারাজের মুখের দর্পণে মনের প্রতিবিম্ব দেখতে পায়। উত্তপ্ত আন্তরিকতায় সে মহারাজকে অভ্যর্থনা জানায়। সময়োচিত বাক্যালাপে ধীরে ধীরে লঘু হয়ে আসে মহারাজের মনের ভার।

জীবা রাজাকে শোনায় বুদ্ধের জন্মান্তরের কাহিনীগুলি। মহারাজ মেঘবাহন তন্ময় হয়ে শোনেন সে সকল অমৃত কথা। পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক আর ধর্মজীবনের এমন দিক নেই যা বুদ্ধের জন্মান্তরের কাহিনী-গুলির মধ্যে পাওযা যায় না। মহারাজের চরিত্র, তাঁর জীবনধারা, তাঁর লোক-ব্যবহার, রাজ্যশাসন প্রণালী ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হতে থাকে। মেঘবাহন মনে মনে তথাগত বুদ্ধের চরণে আত্মসমর্পণ করেন।

একদিন জীবার মুখে জাতক কাহিনী শুনতে শুনতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। জীবা উদ্যান-বাটিকায় রক্ষিত সুবর্ণ নির্মিত বুদ্ধের বন্দনা শুরু করল। জীবার কণ্ঠের স্তবগান সন্ধ্যা সমীরে অপূর্ব সুরধ্বনি তুলে ছড়িয়ে পড়ল জলতল আর নভোলোকে।

মহারাজ মেঘবাহন তদ্গত চিত্তে সেই ধ্বনি শুনতে শুনতে রূপান্তরিত হয়ে গেলেন মৌর্যসম্রাট ধর্মাশোকের অমৃতসত্তায়। ঠিক সেই মঙ্গলমুহূর্তে উদ্যানসংলগ্ন পর্বত শিখরে শুভ্র পূর্ণ চন্দ্রের উদয় হল। মহারাজ সেই শান্ত জ্যোতির্ময় চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে করুণাময় বুদ্ধের আবির্ভাব অন্তরে অনুভব করলেন। মুখে উচ্চারিত হল সেই পরমবাণী ঃ বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

ধীরে ধীরে মহাবাজ মেঘবাহনের পাশে এসে দাঁড়াল জীবা।

মহারাজ তার দিকে তাকিয়ে বললেন, আজ আমার সমস্ত অন্তর চাইছে আপনাকে কিছু দিয়ে তৃপ্ত হতে। আপনি আপনার অভিলষিত বস্তু প্রার্থনা করুন, আমি অর্পণ করে কৃতার্থ হই।

জীবা অনুভব করল মহারাজ মেঘবাহনের দিব্য-উপলব্ধি ঘটেছে। সে বলল, মহারাজ, আপনি চিরদিনই দাতা আর আমি ভিক্ষুণী। আমার তো আপনার কাছে নিত্য প্রার্থনা। আপনি তা পূর্ণও করে এসেছেন এতদিন। তবু যখন নতুন করে প্রার্থনার অধিকার দিলেন তখন আমার অন্তরের বহুদিনের একটি আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপদানে সাহায্য করুন।

প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি পূর্ণ হবে আপনার আকাঙ্ক্ষা।

জীবা চন্দ্রালোকিত পর্বতের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল, মহারাজ, ঐ পর্বত আপনার মহৎ দানে রূপান্তরিত হোক একটি বৌদ্ধ বিহারে। সারা কাশ্মীরে ভিক্ষুণীদের জন্য এটিই হোক প্রথম বিহার।

মহারাজ বললেন, শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের আহ্বান জানিয়ে তৈরি হবে এই বিহার। আমার রাজকোষ উন্মুক্ত থাকবে এই বিহার নির্মাণের কাজে।

মহারাজ বহু অর্থ ব্যয়ে গান্ধার থেকে শিল্পীদের আহ্বান করে নিয়ে এলেন। তাদের সঙ্গে যুক্ত হল ভারতীয় ভাস্করের দল। তারা পাহাড় কেটে তৈরি করতে লাগল চৈত্য, স্তূপ, স্তম্ভ। ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগল দৃষ্টি নন্দন এক বিহার। তক্ষণ শিল্পীদের নিপুণ হাতে খোদিত হতে লাগল বিনয়পিটকের (বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের পালনীয় বিধি নিষেধ) বাণী। মূর্তি শিল্পীরা বুদ্ধ আর বোধিসত্ত্বকে অবলম্বন করে রচনা করে চলল ভাস্কর্যের অপূর্ব সব নিদর্শন। গুহাগাত্রে বর্ণপ্রলেপে চিত্র-শিল্পীরা অঙ্কন করতে লাগল বুদ্ধজীবনের বহু বিচিত্র ঘটনাবলী।

সপ্ত বর্ষের কঠোর শ্রম আর শ্রদ্ধায় গড়ে উঠল নয়নাভিরাম বৌদ্ধ বিহার। তার উদ্বোধনের দিন নির্ধারিত হল, কুবারজীব আর বিক্রমকেশরীর তক্ষশীলা থেকে প্রত্যাবর্তনের পরদিবস। ঠিক সেই দিনটিই আবার বৈশাখী বুদ্ধ পূর্ণিমার শুভলগ্ন।

সুসমাপ্ত বিহারটি এখন নির্জন। উদ্বোধন দিনের অপেক্ষায় সুশোভিত।

বিহারের মধ্যবর্তী চৈত্যের শীর্ষদেশ অর্ধ ঘণ্টাকৃতি। চৈত্যের দুই পার্শ্বে সারি সারি গুহা। প্রবেশমুখে এক একটি নিপুণ ভাস্কর্য-খোদিত স্তম্ভ। স্তম্ভগাত্রে বিনয় পিটকের উৎকীর্ণ উপদেশাবলী। চৈত্যের প্রবেশ পথের দুই পার্শ্বে মূল্যবান প্রস্তর নির্মিত উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি। প্রসন্ন. করুণাঘন, বরাভয়দাতা। গুহাগুলির অধিকাংশই সুধাস্ফটিক পাষাণ নির্মিত। পর্বতের সানুদেশ থেকে মণি-সোপান (শ্বেত পাথরের সিঁড়ি) ঊর্ধ্বে চৈত্যের পাদপীঠে গিয়ে শেষ হয়েছে।

পর্বতসংলগ্ন উপবীতের মত যে ঝর্ণার ধারা নিম্নের স্রোতস্বিনীতে এসে পড়ত সেটির শুভ্র, সুশীতল বারি ধরে রাখা হয়েছে কয়েকটি প্রস্তরনির্মিত কৃত্রিম জলাধারে।

যে দুই প্রান্তে বিহার শেষ হয়েছে তারপর থেকেই স্বাভাবিক পার্বত্য অরণ্যের শোভা সমগ্র বিহারটিকে অপূর্ব মহিমা দান করেছে।

চন্দ্রালোকে স্বপ্নময় পরিবেশ। চৈত্যের তোরণ-শীর্ষ থেকে প্রলম্বিত পিত্তল নির্মিত ঘণ্টাগুলি বায়ুতাড়িত হয়ে মধুর ধ্বনিতরঙ্গের সৃষ্টি করছিল।

সোপানের ওপর দাঁড়িয়েছিল দুটি মূর্তি। একটি নারী, অন্যটি পুরুষ।

পুরুষ মূর্তিটি প্রথমে কথা বলল, আজ থেকে সারা রাজ্যে পশুহত্যা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে।

নারী বলল, বুদ্ধের অপার করুণা নিরন্তর এ রাজ্যের ওপর বর্ষিত হবে।

বিহারে নির্মাণের যে প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছিলাম তা পূর্ণ করতে পেরে

আজ আমি পরম সুখী।

আপনার জন্য রইল আমার শ্রদ্ধা, ভালবাসা, কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য।

পুরুষ বলল, এই বিহারের একটি নামকরণ প্রয়োজন।

নারী স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, স্থির হয়ে আছে এর নাম।

শোনার জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে পুরুষটি বলল, শুনতে পারি কি সেই বিশেষ নাম ?

'অমর্ত-বিহার'। এই বিহারের ভেতর দিয়ে মহারানীর নামটিকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে চাই। অমর্ত-প্রভা অমরত্ব লাভ করুন এই বিহারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে।

তিনি আজ যেখানেই থাকুন, পরম তৃপ্তিলাভ করবেন। এ খবরে সবচেয়ে খুশী হবে আমার চম্পাবতী।

প্রাসাদের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে মহারাজ মেঘবাহন চম্পা চম্পা বলে কন্যাকে ডাকতে লাগলেন।

চম্পা ত্রস্ত পায়ে মহারাজের সামনে এসে বলল, এই যে আমি বাবা।

মহারাজ পরম আদরে কন্যাকে নিয়ে গেলেন উপবেশন-কক্ষে। নিজের পাশে বসিয়ে বললেন, মা, আজ বিহারে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে তোমার জন্যে বয়ে এনেছি একটি সংবাদ।

কি সংবাদ বাবা ?

ভিক্ষুণী জীবা নতুন বিহারের নামকরণ করেছেন তোমার মায়ের নামে। 'অমর্ত-বিহার'।

অসাধারণ পরিকল্পনা জননী জীবার। আমরা যখন বিহার রচনা আর তার উদ্বোধনের উন্মাদনায় মত্ত, তখন কিন্তু তিনি ভোলেননি আমার জননীর কথা।

মহারাজ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন কতক্ষণ। একসময় চম্পার দিকে চোখ তুলে বললেন, মা, কিছুদিন থেকে তোমাকে একটি কথা বলব বলে আমি মনে মনে বড় অস্থির হয়ে উঠেছি।

চম্পা বাবার বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, কিসের অস্থিরতা বাবা ? আমার সঙ্গে কথা বলবে, তাতে আবার অস্থিরতা কি ? এখন সহজ করে বল তোমার কথা।

তুমি আমার একমাত্র কন্যা মা, তোমাকে আমি সুখী দেখতে চাই।

আমি অসুখী রয়েছি তোমাকে কে বললে বাবা।

তুমি বড় হয়েছ মা, এখন তোমাকে নতুন জীবনে প্রবেশ করতে হবে। তুমি সুখী হবে আমরাও সুখী হব।

চম্পা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, তুমি আমাকে তোমার কাছ থেকে সরিয়ে দিতে চাও বাবা।

আমি তোমাকে আমার কাছে রাখতে চাই মা। এখন শোন আমি কি চাই। আমার কথা শেষ হলে তুমি তোমার মতামত জানিও।

চম্পা তাকিয়ে রইল তার বাবার মুখের দিকে।

মহারাজ বললেন, কুমারজীব কালই ফিরে আসছে রাজধানীতে। যুবক হিসেবে সে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। তুমি তাকে দীর্ঘদিন অতি নিকটে থেকে দেখেছ। আমার ইচ্ছে তোমার জীবনের সঙ্গে তার জীবন যুক্ত হোক।

তোমার ইচ্ছার সঙ্গে আমার ইচ্ছার কোনো বিরোধ নেই বাবা। আমিও দীর্ঘদিন মনে মনে প্রস্তুত হয়েছি তাকে গ্রহণ করবার জন্য।

উল্লসিত হয়ে উঠলেন মহারাজ মেঘবাহন, শুধু তোমার মত নেওয়া হয়নি বলে আমি কুমারজীবের জননীর কাছে এ প্রস্তাব রাখতে পারিনি মা।

এখনও আমার সব কথা বলা হয়নি বাবা। আমি নিশ্চয়ই কুমারজীবকে চাই, তবে সংসার জীবনের ভেতর বন্দী করে রাখার চেষ্টা করলে কোনো দিনও পাব না তাকে। বন্ধনের মাঝে সে ধরা দেবার নয়।

তবে তুমি কিভাবে তাকে পেতে চাও?

এই বিপুল পৃথিবীর সঙ্গে যেখানে তার যোগ, সেখানেই আমাকে বাঁধতে হবে আমার মিলনের মঙ্গলসূত্রটি। আমি জানি, ঐ একটিমাত্র স্থান যেখানে আমি ওকে চিরদিনের বন্দনে ধরে রাখতে পারব।

মহারাজ মেঘবাহন কন্যার মস্তকে হাত রেখে বললেন, মা, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কোনো দিনই কোনো কথা বলিনি, আজও বলব না। শুধু বলব, জীবনে তুমি যে পথই বেছে নাও, ঈশ্বর যেন তোমাকে আনন্দ আর শান্তি থেকে বঞ্চিত না করেন।

আজ বুদ্ধ পূর্ণিমার পবিত্র তিথি। প্রভাতের আলোক প্রস্ফুটিত হবার আগেই প্রাসাদ সংলগ্ন বিতস্তার বুকে ভেসে এল শত শত নৌকো। নগর, জনপদ শূন্য করে নরনারী, শিশু, বৃদ্ধ, যুবা আজ সমবেত হয়েছে প্রাসাদের সম্মুখে। এই প্রাসাদ থেকেই বেরুবে শোভাযাত্রা। সেই যাত্রা শেষ হবে অমর্ত-বিহরের পাদদেশে।

প্রভাত সূর্যের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে রাজপ্রাসাদ থেকে শোনা গেল মাঙ্গলিক বাদ্যধ্বনি। দ্বাদশটি পুষ্পমাল্য শোভিত তরণী একে একে বেরিয়ে এল প্রাসাদ সংলগ্ন ঘাট থেকে। মুণ্ডিত মস্তক ভিক্ষুণীরা বসে আছেন সেইসব তরণীতে। চীনাংশুকের ধ্বজা উড়ছে প্রভাত সমীরে।

প্রথম তরীণতে স্বয়ং মহারাজ। তাঁর দুই পার্শ্বে চম্পা আর বাক্। তরণীর একেবারে সম্মুখে চিত্রিত ছত্রের তলায় উচ্চ আসনে উপবিষ্ট কুমারজীব। বৌদ্ধ শ্রমণের কাষায় বর্ণরঞ্জিত বস্ত্র পরিধানে। মুণ্ডিত মস্তক। দুই নেত্রে অপার করুণার ছায়া। প্রথম সূর্যের আলোকে প্রদীপ্ত মুখমণ্ডল।

কুমারজীবের হস্তে একটি অপূর্ব প্রস্তর নির্মিত কলস। সেই কলস গাত্রে উৎকীর্ণ বুদ্ধ-বাণী। কলসের অভ্যন্তরে বহু শ্রমে সঞ্চিত বুদ্ধের পূতাস্থি কণিকা। অমর্ত-বিহারে রক্ষিত হবে সেই অমূল্য সম্পদ।

কুমারজীবের পার্শ্বে তার আবাল্য সুহৃদ বিক্রমকেশরী। অঙ্গে যুবরাজের বর্ণাঢ্য পরিধেয়।

আজ এই মহাসমারোহে যাঁর অনুপস্থিতি এই তরণীর সকলকে গভীর ভাবে অলোড়িত করেছে, তিনি এই বিশেষ তরণীর সমস্ত আরোহীর গুরু মাধবস্বামী। মাত্র ছয় মাস পূর্বে আশ্রমের প্রশান্ত পরিবেশে তিনি চিরশান্তি লাভ করেছেন।

বুদ্ধের পূতাস্থি বাহিত প্রথম তরণীর পশ্চাতে পুষ্পমাল্য শোভিত একাদশটি তরণী সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে চলেছে। তার পশ্চাতে মিছিল করে এগিয়ে আসছে আবাল-বৃদ্ধবণিতা পূর্ণ শত শত তরণী।

সুমধুর, সুগম্ভীর বাদ্যধ্বনির সঙ্গে মধ্যে মধ্যে উচ্চারিত হচ্ছে প্রভু বুদ্ধের নাম-গান। পার্শ্ববর্তী পর্বতে উঠছে সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি। তুষার পর্বত-শৃঙ্গগুলি সোনার মুকুট পরে, গায়ে শুভ্র উত্তরীয় জড়িয়ে স্থির হয়ে দেখছে এই পবিত্র সুন্দর শোভাযাত্রা। যেন দেবলোক থেকে অভ্যাগতরা এসে আসন গ্রহণ করেছেন।

শোভাযাত্রা এসে পৌঁছল উদ্যান বাটিকায়। সমবেত জনতা এই স্থানে অবতরণ করল, নৌকা থেকে সম্মিলিত কণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠল অমিতাভ বুদ্ধের।

চৈত্যের শীর্ষে ধাতু নির্মিত একটি বুদ্ধ মূর্তি শোভা পাচ্ছে। প্রভাতের আলোকপাতে সে মূর্তি উজ্জ্বল সুন্দব সুষমামণ্ডিত হয়ে উঠেছে। সমবেত জনতা দেখল চৈত্যের পাদপীঠ থেকে সোপান বেয়ে নেমে আসছে একটি মূর্তি। সূর্যালোকে উদ্ভাসিত সেই দেবী প্রতিমা। তিনি বিহারের শেষ সোপানটিতে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর দিকে পূতাস্থি-কলস নিয়ে এগিয়ে গেল কুমারজীব। তিনি কলস গ্রহণ করলেন। সম্মিলিত কণ্ঠে ধ্বনিত হল—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধম্মং শরণং গচ্ছামি
সংঘং শরণং গচ্ছামি।

ভিক্ষুণীদের সঙ্গে নিয়ে সেই শ্রমণী উঠে চলে গেলেন সোপান বেয়ে। চৈত্যের অভ্যন্তরে সুবর্ণ নির্মিত বুদ্ধের সিংহাসনের তলদেশে রক্ষিত হল সেই কলস।

সারাদিন অর্চনার শেষে ভাবাপ্লুত জনতা সন্ধ্যালগ্নে ফিরে গেল নিজ নিজ গৃহাভিমুখে।

চন্দ্রোদয় হল। বৈশাখী বুদ্ধ-পূর্ণিমার দীপ্তি নিয়ে পর্বত শীর্ষে দেখা দিল নীল নভোলোকবিহারী শশাঙ্ক।

উদ্যান বাটিকায় দেখা গেল আলাপনিরত কয়েকটি মূর্তি।

চম্পা বলল, বাবা, আমি জননী জীবার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছি, রাজপ্রাসাদে আর ফিরে যাব না।

মহারাজ মেঘবাহন উদ্গত অশ্রু রোধ করে বললেন, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক মা। শুধু অনুরোধ, যদি কোনোদিন এই উদ্যানবাটিকায় আসি তাহলে বিহার থেকে নেমে এসে একবার দেখা দিয়ে যেও।

এবার কুমারজীবের দিকে ফিরে মহারাজ বললেন, কুমারজীব, তুমি আর তোমার জননী আজ যে আলো জেবলে দিলে তাকে প্রজ্বলিত রেখো, এই কামনা। আমার রাজ্যের প্রতিটি মানুষ আজ ভগবান বুদ্ধের শরণ নিয়েছে। ধীরে ধীরে তাদের মন থেকে দূর হয়ে যাচ্ছে সংস্কারের অন্ধকার। তুমি সমস্ত রাজ্যের ধর্মরক্ষক হয়ে মহামতি অশোকের আদর্শে সুস্থ, সমৃদ্ধ ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা কর।

মহারাজ।

বল কুমারজীব। আমি পুত্রহীন কিন্তু তুমি আমার দৃষ্টিতে পুত্রেরও অধিক। চম্পা আজ ভিক্ষুণী, শুধু তুমি রইলে আমার দৃষ্টির সামনে। ধর্মানুশাসনে রাজ্য রক্ষা কর।

মহারাজ, আমি পিতৃহীন। জননীর হাত ধরে সম্পূর্ণ অপরিচিত এই রাজ্যে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে আপনি পিতৃস্নেহে আমাকে রক্ষা করেছেন। আজ আমার যদি কিছু আত্মিক উন্নতি ঘটে থাকে তাহলে মহারাজের কাছে ঋণস্বীকার না করে আমার উপায় নেই। কিন্তু মহারাজ—।

বল কুমারজীব। আমার কাছে কোনো কুণ্ঠা রেখো না।

মহারাজ, অন্তরে আমি পেয়েছি প্রভুর আদেশ। তিনি আমার হাতে তুলে দিয়েছেন দীপ। তাঁর ইচ্ছায় আমাকে সেই দীপ নিয়ে চলতে হবে। যেখানে অন্ধকার সেখানে জ্বালাতে হবে আলো। তিনি আমার হাতে তাঁর দীপটি ধরিয়ে দিয়ে বিশ্বপথিক করে দিয়েছেন মহারাজ।

স্তব্ধ হয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন মেঘবাহন। তাঁর হৃদয় সব হারানোর বেদনায় ভেঙে পড়তে চাইল। কিন্তু পরক্ষণেই এক আশ্চর্য শক্তি তাঁকে সঞ্জীবিত করে তুলল। তিনি ধীরে ধীরে বললেন, বিশ্ব মানবের জন্য যে প্রাণ কাঁদে তাকে আমি দুটো বাহুর বাঁধনে বেঁধে রাখব এমন সাধ্য কই। তোমার জ্ঞানের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ুক, তাতেই আমার পরম শান্তি আর পরিতৃপ্তি খুঁজে পাব কুমারজীব।

এবার জীবার দিকে তাকিয়ে বললেন, কুমারজীবের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে দুটি শুভ নক্ষত্র। তার একটি নক্ষত্র আপনি অন্যটি ভগবান বুদ্ধ। আপনি শুকতারার মত তাকে দিয়েছেন প্রভাতের সন্ধান। আর করুণাময় বুদ্ধ ধ্রুবনক্ষত্রের মত স্থির আলোকের লক্ষ্যে তাকে আকর্ষণ করে নিয়ে চলেছেন।

সামান্য সময় নীরব থেকে বললেন, একটি শিশুকে একদিন আপনি পক্ষচ্ছায়ায় আবৃত করে নিয়ে এসেছিলেন। আজ সে নিজেই আলোর জগতে দুটি পাখা মেলে দিয়েছে। তবু বলব, জননীর নিরন্তর দৃষ্টি থেকে সে যেন বঞ্চিত না হয়। আপনি থাকুন কুমারজীবের সঙ্গে, তাহলে দূরে থেকেও আমি গভীর শান্তি লাভ করব।

মহারাজ নীরব হলেন। চন্দ্রালোকিত উদ্যান-বাটিকার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেল এক ঝলক সুশীতল বাতাস।

কুমারজীব বলল, মহারাজ, বন্ধু বিক্রমকেশরীর সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। আপনি জননীর সঙ্গে বাক্যালাপ করুন। আমি এখুনি ফিরে আসছি।

কুমারজীব চলে গেল বিক্রমের কাছে। বাকের সঙ্গে সেখানে তক্ষশীলা নিয়ে আলাপ করছিল বিক্রমকেশরী। সে আলাপে যোগ দিল কুমারজীব। তক্ষশীলার কত বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা দুবন্ধু শোনাতে লাগল বাককে। একসময় কুমারজীব বিক্রমকেশরীকে লক্ষ্য করে বলল, বিক্রম, একই বিশ্ববিদ্যালয়ে একই আচ্ছাদনের তলায় থেকে আমরা পাঠাভ্যাস করেছিলাম। পাঠশেষে তক্ষশীলার প্রধান আচার্যের কাছ থেকে স্ব স্ব বিভাগে শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কারও লাভ করে-ছিলাম। আমি পেয়েছিলাম গান্ধারের ধাতু নির্মিত বুদ্ধমূর্তি। আর তুমি পেয়েছিলে দশার্নের শিল্পীদের হাতে তৈরি তরবারি। সেদিন আমি তোমার কৃতিত্বে উল্লসিত হয়ে তোমাকে বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে কিছু দেবার প্রস্তাব করেছিলাম। যত অকিঞ্চিৎকর হোক, তা তুমি সানন্দে গ্রহণ করবে বলে প্রতি-শ্রুতি দিয়েছিলে। আমি আজ তোমাকে সেই বস্তুটি দিতে চাই বিক্রম। সেটি অকিঞ্চিৎকর কি অমূল্য সে বিচারের ভার রইল তোমার ওপর।

বিক্রমকেশরী দক্ষিণবাহু প্রসারিত করে বলল, তোমার দান আমার কাছে চিরজীবন পরম গৌরবের হয়ে থাকবে কুমারজীব। সেখানে মূল্যের বিচারে কখনো দানের পরিমাপ করা যাবে না।

বাককে কাছে টেনে নিয়ে এসে কুমারজীব বলল, এ রত্ন তোমার অচেনা নয় বন্ধু। গুরুমাধবস্বামী তক্ষশীলা যাত্রার আগে আমাকে একান্তে বলেছিলেন, ফিরে এসে যদি আর আমাকে দেখতে না পাও তাহলে বাকের দায়িত্বভার তুমি গ্রহণ কর।

সেদিন বাকের অগ্রজ হিসেবে যে দায়িত্ব মাথা পেতে নিয়েছিলাম আজ সেই অধিকারে পরম স্নেহের ভগ্নীকে তোমার হাতে আমার প্রতিশ্রুত উপহার হিসেবে সমর্পণ করতে চাই।

বিক্রমকেশরী বাকের হাত ধরে বলল, এ উপহার অনন্য কুমারজীব। আমি সারাজীবন নিষ্ঠার সঙ্গে এর মর্যাদা রক্ষার চেষ্টা করব।

কুমারজীব, মহারাজ মেঘবাহন, জননী আর চম্পার কাছে সংবাদটি পরিবেশন

করামাত্র উদ্যান-বাটিকায় একটি উল্লাসের হিল্লোল প্রবাহিত হল। বাক্ ও বিক্রমকেশরী কাছে এসে সকলকে যথাযোগ্য অভিবাদন জানালে কুমারজীব বলল, মহারাজ, বিক্রমকেশরী আপনার পুত্রস্থানীয় এবং গুণগ্রাহী। সে অস্ত্রবিদ্যায় শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন হিসেবে দর্শানের তরবারি লাভ করেছে। আপনি আপনার রাজকার্যে এই শৌর্যশালী, বিবেচক তরুণ যুবকের পরামর্শ ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করলে লাভবান বলে মনে করি।

মহারাজ মেঘবাহন বললেন, দীর্ঘকাল যে দুটি পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে মানসিক দিক থেকে, সেই দুই পরিবারের মিলনের দূত হয়ে এসেছে বিক্রম-কেশরী। আমার রাজকার্যে এখন থেকে সে-ই হবে আমার ব্যক্তিগত প্রধান পরামর্শদাতা।

এবার কুমারজীব একটি নিভৃতে তরুতলে নিয়ে গেল চম্পাকে।

আজ আমার আনন্দের শেষ নেই চম্পা।

নির্নিমেষ কুমারজীবের মুখের দিকে চেয়ে রইল ভিক্ষুণী।

একটু থেমে আবার বলল, কুমারজীব, যে মহাবস্তুর স্পর্শ লাভ করে তুমি রাজ্য, সম্পদ তুচ্ছ জ্ঞানে ভিক্ষুণী সাজলে সেই বস্তু তোমাকে দিব্য আনন্দ দান করুক।

চম্পা বলল, তুমি শুধু কামনা কর, ক্ষুদ্র সুখের গণ্ডী পার হয়ে আমরা যেন চিরস্থায়ী আনন্দের জগতে মিলিত হতে পারি।

সেটা শুধু তোমার আমার হৃদয়ের কথা নয় চম্পা, যিনি আজ আমাদের হৃদয়ের অধীশ্বররূপে বিরাজ করছেন, তাঁরও এই অভিপ্রায়।

তোমার দেখা কি আর কোনোদিনও পাবনা কুমারজীব ?

পাবে বইকি। ধ্যানের ভেতর দিয়ে যখনই ইচ্ছে হবে তখনই পরস্পর লাভ করব পরস্পরের সান্নিধ্য। সেখানে বিচ্ছেদ নেই চম্পা।

জননী জীবার সঙ্গে কুচীতে ফিরে চলেছে কুমারজীব। করুণাময় বুদ্ধের অসামান্য আলোকদূত চলেছে ভারতভূমি ছেড়ে বহির্ভারতের পথে। মহারাজ মেঘবাহন তাঁর সাম্রাজ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত নির্মাণ করে দিয়েছেন বিজয় তোরণ। বুদ্ধের ধর্মবিজয়ের স্মারকচিহ্ন এগুলি।

পথের দুদিকে জনপদবাসীরা দিচ্ছে জয়ধ্বনি। পুষ্প বৃষ্টি করে জননী ও পুত্রের পথকে কুসুমাস্তীর্ণ করে দিচ্ছে বিচ্ছেদ আকুল জনতা।

একসময় তারা পার হয়ে গেল রাজ্যের সীমা। যে পথ দিয়ে এসেছিল একদিন সেই পথ ধরেই ফিরে চলল কুচী অভিমুখে। এখন পথ পরিচিত। অন্তরের অনির্বাণ আলোকে উদ্ভাসিত।

চার

পথের ওপর হুঞ্জাদের সেই গ্রাম। বৌদ্ধ স্তূপ নির্মাণ করেছে হুঞ্জারা। জীবা আর কুমারজীবকে লাভ করে তাদের আনন্দের সীমা পরিসীমা নেই। বহুদিন পরে যেন তারা ফিরে পেয়েছে হারানো আপনজনকে। কিছুতেই ছেড়ে দেবে না তাদের। কুমারজীব দেখল, গ্রামটি যেন আনন্দ-নিকেতন। প্রতিদিন কিশোরী মেয়েরা নৃত্যের লীলায় তাদের আহ্বান করে নিয়ে যায় মন্দিরে। সেখানে গ্রামবাসীরা বসে থাকে বুভুক্ষুর মত বুদ্ধের অমৃত বাণী শোনার আশায়। কুমারজীব গল্পের ছলে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয় জীবনের পরম সত্যের রূপ।

একটি বছর হুঞ্জাদের মধ্যে অতিবাহিত করে, পার্বত্য গ্রামগুলিতে প্রচারকার্য পরিচালনা করল কুমারজীব। সম্পূর্ণ হুঞ্জা অধ্যুষিত অঞ্চলটিকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করে মাতা পুত্র চলল শুলিদেশ লক্ষ্য করে।

দুর্গম পামীর অতিক্রমের পথে দেখা হয়ে গেল কিরঘিজদের সঙ্গে। তেমনি উষ্ণ অভ্যর্থনায় সংবর্ধিত হল তারা। এবার কুমারজীবের মুখে তারা শুনল বুদ্ধের জীবনী ও বাণী। যাযাবর কিরঘিজরা দলে দলে গ্রহণ করল বৌদ্ধধর্ম।

পামীর পার হয়ে শুলি, চোক্কুক, গোদানে চার বছরেরও অধিককাল ঘুরে ফিরল মাতা পুত্রে। সেখানকার রাজগৃহে, বিহারে তারা সম্মানিত হল রাজাধিরাজ ও রাজমাতার মত। প্রতিটি ধর্মালোচনা সভায় কুমারজীব বৌদ্ধশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়ে বিমুগ্ধ করল বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের। বিদ্যার্থী আর বণিকদের মুখে মুখে কুমারজীবের নাম ছড়িয়ে পড়ল দিগ্বিদিকে।

কুমারজীব জননীর সঙ্গে এবার যাত্রা করল কুচীর উদ্দেশ্যে। পথে পড়ল সেই ভগ্ন বুদ্ধমন্দির, যেখানে হুন দস্যুদের ভয়ে তারা আত্মগোপন করেছিল। মেষ চারকদের কাছে সংবাদ নিয়ে তারা জানতে পারল বৃদ্ধ পুরোহিত বহু পূর্বেই দেহরক্ষা করেছেন।

আবার যাত্রা। পথে সঙ্গী হল নূতন নূতন বণিকের দল। নিজ নিজ পথে আবার চলে গেল তারা। যেখানে মানুষের সঙ্গ সেখানেই কুমারজীব প্রচার করে চলে প্রভুর অমৃত বাণী। কুমারজীবের দিব্যকান্তি দর্শনে আকৃষ্ট হয় পথচারী। তার কণ্ঠ নিঃসৃত উপদেশে সম্মোহিত হয়ে যায় শ্রোতার হৃদয়।

দূরে তিয়েনশান পর্বতের তুষার চূড়ায় তখন অস্ত সূর্যের শেষ রশ্মির সমারোহ। একটি পার্বত্য পথ ধরে নামছিল মাতা পুত্রে। অদূরে কুচীর বৌদ্ধ স্তূপের ওপর ধাতু নির্মিত চূড়াগুলি অস্তরাগে অলৌকিক মহিমা লাভ করছিল।

সহসা সামনে পথ অবরোধ করে দাঁড়াল অস্ত্রধারী সৈনিক। থেমে গেল যাত্রা।

কোথায় চলেছ তোমরা ?

কুমারজীব উত্তর করল, কুচীর বৌদ্ধ বিহারে।

কি নাম তোমার ?

ভিক্ষু কুমারজীব।

কুচী অবরুদ্ধ, তোমরা ক্ষণকাল এখানে অবস্থান কর। চীন সম্রাটের অনুমতি এলে তবেই প্রবেশের অধিকার পাবে।

বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হলে এক অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কুমারজীব ও জীবার সম্মুখে এসে অভিবাদন জানিয়ে বললেন, সম্রাট আপনাদের কুচীতে প্রবেশের পূর্ণ অধিকার দিয়েছেন।

জননীর হাত ধরে কুমারজীব নেমে চলল কুচী নগরীর প্রবেশ পথের দিকে। দুজনের হৃদয়ই চিন্তা ভারাক্রান্ত। কুচী আক্রান্ত, অবরুদ্ধ। মহাচীনের বাহিনী নিয়ে চীন সম্রাট স্বয়ং উপস্থিত।

জীবা ভাবছে অগ্রজ রজতপুষ্পের কথা। কুচীর বিপত্নীক আর নিঃসন্তান মহারাজ, ভাগিনেয় কুমারজীব-অন্তঃ প্রাণ ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর সিংহাসনে তাঁর অবর্তমানে উপবেশন করুক তাঁর প্রাণপ্রিয় ভাগিনেয়। কিন্তু জীবা তাঁর অগ্রজের আশা পূর্ণ হতে দেয়নি। সে তখন পেয়েছে অন্য আলোকের সন্ধান। সে শুনেছে সেই রাজপুত্রের কাহিনী যিনি সিংহাসন, সম্পদ, সহধর্মিনী, সন্তান সর্বকিছু ত্যাগ করে চলে এসেছিলেন বিরাট বিশ্বে মানুষের দুঃখমোচনের জন্য। সেই রাজ্যহীন রাজরাজেশ্বরের পথ ধরে চলুক তার একমাত্র সন্তান, এই ছিল জীবার অভিলাষ।

মহারাজ রজতপুষ্প কোনোদিনই কোনো কাজে বাধা দেননি ভগ্নী জীবাকে। কুমারায়ণের সঙ্গে ভগ্নীর বিবাহে তিনি দান করেছিলেন পূর্ণ সম্মতি। অনুষ্ঠিত হয়েছিল স্বয়ম্বর সভা। নিজের কৃতিত্বের পরিচয় দিযে সেদিন তক্ষশীলার তরুণ ছাত্র কুমারায়ণ তাকে লাভ করেছিল। স্বয়ম্বর সভায় আরও যাঁরা সেদিন উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে চীনের যুবরাজ আর অগ্নিদেশের রাজা আজও মুছে যায়নি তার স্মৃতি থেকে। সেই চীনের প্রতিহিংসাপরায়ণ যুবরাজ কি এতকাল পরে সম্রাটের সর্বশক্তি নিয়ে এল সেদিনের পরাভবের প্রতিশোধ নিতে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হবার সঙ্গে সঙ্গে মাতাপুত্রে এসে দাঁড়াল কুচীর তোরণ দ্বারে। নগরীর বিপণী, রাজপ্রাসাদ অন্ধকারে মগ্ন। সামান্যমাত্র আলোকরশ্মি দেখা গেল না কোনো ছিদ্রপথে। বৌদ্ধবিহার থেকে শোনা গেল না সান্ধ্য পূজার সুগম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি।

উন্মুক্ত তোরণদ্বার পেরিয়ে তারা নগরীর পথ ধরে অগ্রসর হতে লাগল।

জীবা বলল, কুমারজীব, চল আমরা দক্ষিণের পথ ধরে বিহারের দিকে অগ্রসর হই।

প্রাসাদে গেলে আমরা মহারাজের মুখ থেকে সব খবর জানতে পারতাম মা।

আমরা বৌদ্ধ ভিক্ষু, ভিক্ষুণী বাবা। রাজগৃহ আমাদের আশ্রয়স্থল নয়। বিহারেই আমরা জানতে পারব রাজ্যের সর্বশেষ পরিস্থিতি।

কুচী বিহারের সর্বাধ্যক্ষ যখন সংবাদ পেলেন শ্রমণী জীবা পুত্র কুমারজীবকে নিয়ে ফিরে এসেছেন, এবং অপেক্ষা করছেন বিহারের দ্বারদেশে, তখন তিনি ভগবান বুদ্ধের আরতির দীপখানি তুলে নিয়ে দ্রুত পায়ে নেমে এলেন বিহারের বহির্দ্বারে।

প্রদীপখানি মাতাপুত্রের মুখের সামনে তুলে ধরলেন বিহারের প্রধান ভিক্ষু।

জীবা বলল, চিনতে পারবেন কি বিনয়রত্ন ?

ভিক্ষুণী রাজভগ্নী জীবাকে চিনতে পারব না ! কিন্তু এ তুমি কাকে সঙ্গে এনেছ জীবা ! এই জ্যোতির্ময় যুবার পরিচয় কি ?

জীবা বলল, এই যুবক বুদ্ধের সেবক, আমার পুত্র কুমারজীব।

প্রদীপ ভূমিতে রেখে বিহারের বৃদ্ধ ধর্মাধ্যক্ষ দুবাহুর আলিঙ্গনে গভীরভাবে বন্দী করে ফেললেন কুমারজীবকে।

কতক্ষণ পরে আলিঙ্গন মুক্ত করে বললেন, এরই ভেতর তোমার নাম ছড়িয়ে পড়েছে সারা বৌদ্ধ জগতে। বৌদ্ধশাস্ত্রে তুমি অর্জন করেছ অদ্বিতীয় পাণ্ডিত্য। তুমি যুবক হলেও আমার নমস্য।

প্রত্যভিবাদন জানিয়ে কুমারজীব বলল, অপরাধী করবেন না মহাত্মা, আমি প্রভু বুদ্ধের দীন সেবকমাত্র।

এরপর সেই রাত্রির অন্ধকারে স্বল্প দীপালোকে বিহারের শত শত ভিক্ষু কুমারজীবের দর্শনের জন্য প্রার্থনা গৃহে সমবেত হল। সেখানেই জীবা ও কুমারজীব জানতে পারল রাজ্যের ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা।

বৃদ্ধ হয়েছেন মহারাজ রজতপুষ্প। নেই কোনো উত্তরাধিকারী। পরম বৌদ্ধ তিনি, কিন্তু সাম্রাজ্য রক্ষায় যে শক্তির প্রয়োজন তা নেই তাঁর অধিকারে। তাই চীন সম্রাটের আক্রমণের সংবাদ পেয়ে প্রাসাদ ছেড়ে তিনি দুর্গে আশ্রয় নিয়েছেন। অধিকাংশ নাগরিক অনুগমন করেছে তাঁর। চীনের সৈন্যরা সম্রাটের নির্দেশে অবরোধ করেছে দুর্গ।

চীন চায় কুচীর মহারাজ বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করুন, নাহলে ভয়াবহ ধ্বংসের মুখোমুখি হতে হবে কুচী রাজ্যকে।

মহারাজ রজতপুষ্প মাথা পেতে নেবেন না পরাজয়। তিনি পরাভবের চেয়ে মৃত্যুবরণ শ্রেয় বলে মনে করছেন।

পরদিন প্রভাতে একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল। মহারাজ রজতপুষ্প গুপ্তপথে দুর্গ থেকে এলেন বিহারে। মহাধ্যক্ষ, দর্শন-গৃহে আহ্বান করে নিয়ে এলেন জীবা আর কুমারজীবকে। সুদীর্ঘ বিংশতিবর্ষ পরে অশ্রুর ভেতর দিয়ে

মিলন ঘটল ভ্রাতাভগ্নীর।

কুমারজীবের দিকে নির্নিমেষ চেয়ে রইলেন মহারাজ রজতপুষ্প। দুচোখের অশ্রুর প্লাবন।

শেষে চক্ষু মার্জনা করে মঠাধ্যক্ষের দিকে একটি সন্ধিপত্র এগিয়ে দিয়ে বললেন, পড়ে দেখুন।

বিস্মিত মঠাধ্যক্ষ পত্র পাঠ করে চেয়ে রইলেন কুমারজীবের মুখের দিকে।

মহারাজ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, অসম্ভব এ শর্ত। রাজ্যের বিনিময়ে আমি আমার প্রাণের সম্পদ বিলিয়ে দিতে পারি না।

মঠাধ্যক্ষ সন্ধিপত্রখানি জীবার হাতে এগিয়ে দিলেন। জীবা পাঠ করে সেই পত্রখানি তুলে দিল কুমারজীবের হাতে।

কুমারজীব দেখল, সন্ধি পত্রটি চীন সম্রাটই প্রেরণ করেছেন। তাতে লেখা আছে ঃ

কুচীর মহামান্য মহারাজ সমীপে নিবেদন এই যে, দুটি প্রস্তাব আপনার বিবেচনার জন্য প্রেরিত হল। প্রথম প্রস্তাব, যুদ্ধ ও কুচীর ধ্বংস। দ্বিতীয় প্রস্তাব, মহাজ্ঞানী কুমারজীবকে চীন গমনের অনুমতি দান। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি গ্রহণযোগ্য হলে চীনের বাহিনী বিনা যুদ্ধে ফিরে যাবে মহাচীনে।

শেষে একটি ছত্র সংযোজিত হয়েছে ঃ আমরা জানি কল্য সন্ধ্যাকালে তিনি কুচী নগরীতে প্রবেশ করেছেন।

পত্রপাঠ শেষ করে জননীর দিকে তাকিয়ে উল্লসিত হয়ে উঠল কুমারজীব।

বলল, আপনারা আমার জন্য অযথা চিন্তা করে ক্লিস্ট হবেন না। এ চীনের সম্রাটের সন্ধিপত্রের ভেতর দিয়ে ভগবান তথাগতেরই নির্দেশ। মহাভারত থেকে যা আমি সংগ্রহ করে এনেছি, তাই চায় মহাচীন। যুদ্ধ নয়, শান্তিই মানব সমাজের পরম কাম্য। আমি মহাচীনে যাত্রার জন্য প্রস্তুত।

যাত্রার দিন দেখা গেল চীনের সম্রাট নিজের রথে পরম সমাদরে তুলে দিলেন বৌদ্ধ ভিক্ষু কুমারজীবকে। সেই রথ আকর্ষণ করে নিয়ে চলল সাতটি শ্বেত-বর্ণের অশ্ব। সম্রাট স্বয়ং সেই রথের পশ্চাতে অশ্বারোহণে চললেন ধর্মচক্র বহন করে।

প্রদীপ্ত সূর্যের দেশে বিশ্বের রাজাধিরাজ যাত্রা করলেন মহাধর্মবিজয়ে।